

ବିଜ୍ଞାନ-କବି-ଗଳ୍ପ

ଶ୍ରୀ ଅନୋରଥ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা,
পাটুয়াটুলী, ঢাকা



দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৪৫

মূল্য বারো আনা

প্রিন্টার—শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র সুর
আশুতোষ প্রেস
ঢাকা

কোন সুদূর অতীতে মানুষের মনে বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, আজিও কেহ তাহা সঠিকরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। মানুষের মনে যে কৌতূহল-বৃদ্ধি চির-জাগরুক থাকিয়া, মানুষকে নিত্য নব অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সাহায্য করিতেছে, তাহা হইতেই একদা হয়ত মানুষের মনে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। এবং প্রকৃতির অপরূপ রহস্য ভেদ করিতে গিয়াই মানুষের প্রয়োজন হইয়াছিল—বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞানের। বিজ্ঞান অনুশীলনের ইহাই হয়ত ইতিহাস। কত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া, কত ঝড়ঝঞ্ঝার সহিত সংগ্রাম করিয়া, বিজ্ঞান যে বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা প্রত্যেকেরই জ্ঞান প্রয়োজন। ইহা জানিতে হইলে, যে-সমস্ত আত্মতোলা-ভীক্ষুণী মনীষী, আপন অধাবসায় বলে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞানের বনিয়াদ সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত জ্ঞান-বীরের জীবনী এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের কাহিনী আমাদের শ্রদ্ধাতরে পাঠ করিতে হইবে; নহিলে শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও গণিতের সূত্র মুখস্ত করিয়া বিজ্ঞান পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ণধার পরলোকগত শ্রীর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্ততম অবশ্য-পাঠ্যরূপে মাতৃভাষার

সাহায্যে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বৈজ্ঞানিকগণের জীবনীও পাঠ করিতে পারে, কতকটা সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হইল। অতি সহজ ভাষায়, কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের জীবনী ও তাঁহাদের আবিষ্কার-কাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। যদি আমাদের দেশের কিশোর কিশোরীগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতি সামান্য পরিমাণেও উপকৃত হয় তবে আমার শ্রম সম্পূর্ণ সার্থক মনে করিব।

গ্রন্থে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। যদি কোন পাঠক-পাঠিকা ইহা আমাকে জানান, তবে তাহা অতি ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

এই গ্রন্থ রচনার আমাকে আমার কতিপয় শিক্ষা-দান-ব্রতী বন্ধু নানাভাবে উৎসাহ দিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আন্তোয় লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারিগণ এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্বপ্রকার যত্ন লভিয়াছেন—এজন্য তাঁহাদেরও আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি

ঢাকা,
রাস-পূর্ণিমা.
১৩৪৩ সন।

}

শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা

বিজ্ঞানের জন্ম-রহস্য	...	১
গ্যালিলিও	...	২
নিউটন	১৯
আকাশের আলো	৩৩
দাতা নোবেল	৪৩
মানুষের বন্ধু	৫৩
আলোর ভেক্টর	৬৫
আলোক চিকিৎসা	৭৯
পেরডিয়ম	৮৭
আকাশ কেন নীল ?	১১১
টেলিভিসন	১২৭
আইনষ্টাইন	১৪৩

ପି ତ୍ତ ଦେ ବେ ର

ଶ୍ରୀ ଚ ର ଗୋ ଦ୍ଦେ ଶ୍ରେ

বিজ্ঞানের গল্প



বিজ্ঞানের জন্ম-রহস্য

মানুষের মনে কৌতূহল চিরদিনই অত্যন্ত প্রবল। আর তারই ফলে মানুষের মনে একদিন জন্ম হয়েছিল নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানুষ বহু চেষ্টা করেও স্থির করতে পারেনি কোথায় গিয়ে জ্ঞান-রাজ্যের সীমা শেষ হয়েছে। তাই আদিম যুগ থেকে শুরু করে, এখনও মানুষ তীর্থ-যাত্রীর মত জ্ঞান-রাজ্যের পথে ছুটে চলেছে। মানুষের এই যাত্রা কখনও শেষ হবে কিনা—তা কেউ-ই বলতে পারে না।

রাতের বেলা আকাশের বৃকে তারাগুলোকে মিট মিট করে জ্বলতে দেখে—তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবো—ওরা কারা? কেনই বা ওরা আকাশের বৃকে অত উঁচুতে থেকে অমনভাবে মিটমিট করে জ্বলছে। কেমন ভাবে, কোন্ জিনিষকে অবলম্বন করে ঐ মহাশূন্যে অত উঁচুতে ওরা জ্বলছে? আকাশটা ত চারদিকেই ফাঁকা, তবে কেমন করে ওরা ওখানে স্থিরভাবে রয়েছে—কেন স্থানচ্যুত হয়ে খসে মাটিতে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে না! চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ যা কিছু তোমরা আকাশের বৃকে দেখতে পাও—সবাকার সম্বন্ধেই এই এক প্রশ্ন হয়ত তোমাদের মনে জেগে ওঠে। কেমন তাই নয় কি? শুধু কি এ সব

বিজ্ঞানের জন্ম-রহস্য

সম্বন্ধেই জান্‌বার জন্ম তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে ? না— তা নয়। প্রকৃতির সমস্ত রহস্যের কথাই হয়ত তোমরা জানতে চাও। আকাশের বৃকে সপ্তবর্ণে রঞ্জিত রামধনু দেখে 'তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবো—এর গায়ে এমন অপূৰ্ব্ব বর্ণচ্ছটার সমাবেশ হোলো কোথেকে ?...ঘন কালো মেঘের বৃকে বিছাতের চমুকানো দেখে তোমরা হয়ত ভয়ে বিষ্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে যাও !.....দিন রাত্রি কি করে হয় ? গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত. বসন্ত এইসব ঋতুগুলো কি করে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে প্রত্যেক বছরই ঠিক একই সময়ে পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয় ?.....মানুষকে মর্তে দেখে তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবো—কেন এর মরে ? কোন রকমে এদের যদি একেবারে অমর করে রাখা যেতো ! প্রকৃতির রহস্যের এই সব কথা ভাবতে ভাবতে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাও—আর ব্যাকুল হয়ে ওঠ এর কারণগুলো জান্‌বার জন্ম।

পৃথিবীর সব মানুষেরই অবস্থা একদিন তোমাদের মতই ছিল। তারাও এসব রহস্যের কোন খোঁজ খবরই রাখতো না। তারপর ক্রমে এতদা এইসব রহস্য মানুষের মনে এক বিদ্যুৎ প্রশ্ন জাগিয়ে তুললো। মানুষ এসব রহস্যের সমাধান কর্‌বার জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

যার তাই থেকে প্রয়োজন হোলো—বিজ্ঞান বা বিশেষ
জ্ঞানের।

বিজ্ঞানের জন্মের পর থেকে যুগ যুগান্তর অতীত হয়ে
গেছে—কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রকৃতির অসীম রহস্যের কতটুকু
মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে! আদিম মানবের কাছে প্রকৃতি
যতটা দুর্ভেদ্য ছিল আজ বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলেও প্রায়
ততটাই দুর্ভেদ্য রয়ে গেছে। এবং বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে
সঙ্গে ক্রমেই যেন এই জটিলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা
দ্বারা কতক্ষণে সমস্যার সমাধান করে, মানুষ হয়ত সত্য
পৌঁছুতে পেরেছে। কিন্তু ফলে এমন সব সহস্র সহস্র
নূতন সমস্যা এসে মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে যার
কোন মীমাংসা আজও সম্ভব হয়নি। কখনও হবে কিনা—
তা-ও বলা যায় না।

প্রাচীন যুগে মানুষ যখন বিজ্ঞান চর্চা করতে শেখে নি—
তখন তারা প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের মহিমার অপূর্ব বিকাশ
লক্ষ্য করে ভক্তি-প্রণত শিরে একে দেবতা বলেই পূজা
করেছে। আমাদের এই ভাবতর্ষে, প্রাচীন যুগে আর্ঘ্য ঋষির,
ঋড়, বৃষ্টি, আকাশ, বাতাস, সূর্য, আগুন, জল প্রভৃতি
প্রাকৃতিক রহস্যকে দেবতারূপে কল্পনা করে তাদের পূজা
করতেন। শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর বহু দেশেই

প্রাচীন যুগে এইরূপ পূজা করবার রীতি প্রচলিত ছিল। ক্রমে যখন মানুষের মনে প্রকৃত সত্য জানবার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগে উঠলো—তখনই তারা অগ্রসর হোল এই সব চিরন্তন রহস্য ভেদ করতে। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগ থেকে বহু বহু কাল পরে আজ আবার মানুষ প্রকৃতির অসীম রহস্য ভেদ করতে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে—প্রাচীন কালের মানবেরই মত প্রকৃতির মাঝে ভগবানের মহিমার বিকাশ লক্ষ্য করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছে।* কিন্তু তা বলে যে, মানুষ ভগ্নোদ্ধম হয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পরিত্যাগ করেছে তা নয়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে মানুষ নব নব আবিষ্কার দ্বারা জ্ঞানের রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে সত্য; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে আবার নূতন নূতন সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জানিনা, মানুষের পক্ষে কখনও প্রকৃতির অনন্ত রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করা সম্ভবপর হবে কিনা!

* সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান পদার্থবিদ্যা-বিদ Dr. Compton বলেছেন, “Modern Physics gives place to God.” ইনি ১৯২৭ সালে পদার্থবিদ্যায় মৌলিক আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

গ্যালিলিও

অতীতের বৈজ্ঞানিকদের কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে সঠিকরূপে বলা কঠিন। প্রাচীন যুগের অনেক কিছুই আমাদের কাছে অজ্ঞাত। কারণ সে যুগে আজকালকার মত সব কিছুই লিখে রাখবার রীতি প্রচলিত ছিল না। সুতরাং এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের কথাই আমাদের কাছে বলবো।

এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের কথা বলতে হলে, আমাদের সর্বপ্রথম মনে পড়ে গ্যালিলিওর নাম। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা এই গ্যালিলিও। পরীক্ষাদ্বারা বিজ্ঞানের কোন হির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রণালী—যা এ যুগে সর্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরাই অনুসরণ করে থাকেন—সে প্রণালীও গ্যালিলিওই প্রথম প্রচলিত করেন। গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার রীতিও তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

আজ থেকে প্রায় তিন শ' পঁচাত্তর বছর আগে ইটালীর এক অতি দরিদ্র পরিবারে এঁর জন্ম হয়। পিতা দরিদ্র ছিলেন সত্য—কিন্তু ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলবার ইচ্ছাটা তাঁর অগ্ৰাণ্য পাঁচজনের মতই ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল ছেলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে চিকিৎসক হয়। কারণ সে যুগে চিকিৎসকদের ভারী সম্মান ছিল। কিন্তু মানুষের নিজের ইচ্ছায়ই কি সব সময় সব কাজ হতে

গ্যালিলিও

পারে ? ছেলের চিকিৎসা-বিজ্ঞান শেখবার দিকে ঝাঁক
মাত্রও ছিল না। তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল জ্যোতিষ ও
গণিতশাস্ত্র শেখবার দিকে। সুতরাং পিতার ইচ্ছা অপূর্ণই
বয়ে গেল।

সে সময় ইটালীর সব চেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল
পাইসা (Pisa) নগরীতে। গ্যালিলিও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই
ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া
গিয়েছিল। অধ্যাপকেরা গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয় যেমন
বরাবর ক্লাসে পড়ান তেমনিভাবেই পড়িয়ে যেতেন। ঐভাবে
পড়িয়ে কিন্তু তাঁরা গ্যালিলিওর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতেন
না। তিনি তাঁদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে একেবারে ব্যতিব্যস্ত
করে তুলতেন। বলতেন, “এটা কি,” “ওটা কি,” “প্রমাণ
দিয়ে এসব সিদ্ধান্ত বুলিয়ে না দিলে, আর যে-ই মেনে নিক্
আমি মানবো না।” অধ্যাপকেরা চটে গিয়ে বলতেন—
“বাপু, তুমি একেবারে গোল্লায় গেছো। এ সব যে বড় বড়
মহা-পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত। তোমার আমার মত লোকের কথা
ত আর নয় ! সুতরাং তাঁদের কথাগুলো তোমার নির্বিচারেই
মেনে নেওয়া উচিত। এর কোন প্রমাণ চাওয়া তোমার
মত বালকের পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।” গ্যালিলিও
শিক্ষকদের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। তিনি

গ্যালিলিও

গণিত ও জ্যোতিষের সব সিদ্ধান্তগুলোকে প্রমাণ করবার চেষ্টায় বাস্তব হয়ে পড়তেন।

তখনকার দিনে এই নিয়ম ছিল যে বড় বড় পণ্ডিতেরা যেসব সিদ্ধান্ত করে গিয়েছেন, এবং মানুষ চিরদিন ধরে যা শুনে আসছে তা-ই অত্রান্ত সত্য। পরীক্ষাদ্বারা এর আর কোন প্রমাণের আবেশ্য করে না।

লেখাপড়া শেষ হবার পর গ্যালিলিও পাইসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়েই গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপকের কাজ পেলেন। অধ্যাপকের চাকুরীতে প্রবেশ করে তিনি নানা বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোর সত্যতা নির্ধারণ করবার চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

অ্যারিস্টটল নামে একজন প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তি—সিদ্ধান্ত করে গিয়েছিলেন যে, কোন উঁচু জায়গা থেকে যদি ভারী ও পাতলা দু'টো জিনিস একসঙ্গে ফেলে দেওয়া যায়, তাহ'লে ভারী জিনিসটাই আগে মাটি স্পর্শ করবে। সবারই বিশ্বাস ছিল, যে, অ্যারিস্টটলের প্রত্যেক সিদ্ধান্তই একেবারে নিভুল। গ্যালিলিও প্রচার করে দিলেন যে, অ্যারিস্টটলের এই সিদ্ধান্তটাই নিভুল নয় এবং তিনি তা পরীক্ষাদ্বারা সবাইকে বুঝিয়ে দিবেন। গ্যালিলিওর কথা শুনে সকলেই তাঁকে

গ্যালিলিও

পাগল বলে'ভাবলো। সবাই বলতে লাগলো অ্যারিষ্টটলের সিদ্ধান্ত যে ভুল বলতে পারে, শুধু তাই নয়, আবার প্রমাণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিতে চায়, তার স্থান হওয়া উচিত পাগলা-গারদে। গ্যালিলিও মানুষের এসব বিরুদ্ধ মন্তব্য গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। তিনি নির্দিষ্ট একটা দিনে সবার সামনে এটা ভুল বলে প্রমাণ করে দিবেন বলে স্থির করে ফেললেন।

পাইসা (Pisa) নগরীতে প্রকাণ্ড উঁচু একটা বুরুজ বা মিনার আছে। এই বুরুজটা অতি অদ্ভুত ভাবে তৈরী। এটা একদিকে হেলান। দেখেই মনে হয়, এই বুঝি কাং হয়ে পড়ে গেলো। কিন্তু তা তো হবার নয়। যুগ যুগান্তর ধরেই এটা ঐভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনে গ্যালিলিও ছোট ও বড় দুইখণ্ড পাথর নিয়ে গিয়ে ঐ বুরুজের উপরে উঠলেন। নীচে কৌতূহলী জনতা অপেক্ষা করতে লাগলো। উপরে উঠেই গ্যালিলিও পাথর দুইখণ্ড একই সঙ্গে মাটিতে ফেলে দিলেন। দু'টোই এসে একই সময়ে মাটি স্পর্শ করলে। ব্যাপার দেখে কোথায় লোকে তাঁকে বাহবা দিবে তা নয় বরং উল্টো আরও তাকে গালাগাল দেওয়া শুরু করলো।

গ্যালিলিও

তোমরা চোখে দেখে—একটা ব্যাপার—সে যা-ই কেন হোক না—নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর। কিন্তু এ ব্যাপারটা চোখে দেখেও কেউ বিশ্বাস করলে না। কারণ এ ব্যাপারটা যে জ্ঞানী অ্যারিষ্টটলের সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করে দেয়। বরং একদল লোক এই ব্যাপারের জন্ম তাঁর শত্রু হয়ে উঠলো। আজকাল অবশ্য এ নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল যে কোন দেশে একটা নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হলে, সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ আন্দোলিত হয়ে ওঠে। সেই বৈজ্ঞানিককে সম্মান জানাবার জন্ম পৃথিবীর সব দেশে রীতিমত ভাড়াছড়ো পড়ে যায়।

আজ যেমন অতি সহজেই মানুষ বিশ্বাস করে, যে, এরোপ্লেনে চড়ে আকাশপথে উড়ে যাওয়া যায়, সে যুগে এ রকম ব্যাপার হলে চোখে দেখেও মানুষ কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারতো না। হয়ত একে যাদুকরের যাদুবিদ্যা বা ভৌতিক অথবা দানা-দৈত্যের একটা কাণ্ড বলেই মনে করতো।

প্রথম জীবনে গ্যালিলিও নানা রকম আবিষ্কার করতে ভারী উৎসাহ বোধ করতেন। কিন্তু পরে এমন সব ব্যাপার ঘটতে লাগলো যার ফলে তাঁর সমস্ত উৎসাহ একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো।

গ্যালিলিও

তোমরা আজকাল যে পেণ্ডুলাম বা দোলকওয়াল ঘড়ী দেখতে পাও, এ-ও গ্যালিলিওরই আবিষ্কার। খুব অল্প বয়সেই তিনি এই অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারটি করেন। একদিন রাত্রিবেলা তিনি তাঁর বাড়ীর ছাদে বসে ছিলেন; এমন সময় দূরে দেখতে পেলেন—একটা গীর্জার গায়ে ফ্রেনের মধ্যে কোলান আলোকটি ধীরে ধীরে ভারী চমৎকার ভাবে ছলছে। অনেকক্ষণ ধরে খুব মনোযোগের সঙ্গে তিনি ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করলেন। লক্ষ্য করে দেখে, তিনি বুঝলেন, এই দোলবার গতিটি অতি চমৎকার! আলোকটার বামদিকে যেতেও যতটা সময় লাগছে আবার সেখান থেকে ফিরে আসতেও ঠিক ততটাই সময় দরকার হচ্ছে। এই ব্যাপার লক্ষ্য করে, চমৎকার একটা বুদ্ধি তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন এই জিনিষটাকে কাজে লাগাতে পারলে, সময় পরিমাপ করবার একটা চমৎকার যন্ত্র তৈরী করা যেতে পারে। যেই ভাবা সে-ই কাজ। অমনি তিনি ছাদ থেকে ঘরের ভিতর নেমে এলেন। এসেই, সূতোর সঙ্গে একটা চিল বেঁধে তাকে দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে, দোলা দিতে শুরু করলেন। আবার ঠিক ঐ একই ব্যাপার! এবারে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এ উপায়ে ঘড়ী বা সময়

গ্যালিলিও

পরিমাপ করবার যন্ত্র অতি অনায়াসেই তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে।

অল্পদিনের চেষ্টায়ই তিনি একটা ঘড়ী তৈরী করে ফেললেন। এবার আর তাঁকে পায় কে? তাঁর উৎসাহ গেল বেড়ে, তিনি নূতন নূতন আবিষ্কারের কল্পনা একেবারে মেতে উঠলেন। অল্পদিনের ভিতরেই তিনি থার্মোমিটার বা উত্তাপ-পরিমাপক একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন। আজকাল চিকৎসকেরা অতি সহজে যে শব্দীবের তাপ পরীক্ষা করতে পারেন—সে তাঁরই দয়ায়।

গ্যালিলিওর আবিষ্কারের মধ্যে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়ই হচ্ছে টেলিস্কোপ (Telescope) বা দূরবীন। এই দূরবীন আবিষ্কারের ফলে দৃষ্টি-বিজ্ঞানে সে সময় এক নব-যুগের সূচনা হয়েছিল।

দূরবীন আবিষ্কার করবার মাস কয়েক পূর্বে তিনি শুনতে পান যে, একজন ওলন্দাজ ভদ্রলোক ইটালীর কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এমনি চমৎকার একটা জিনিষ উপহার দিয়েছেন যার সাহায্যে ছ' মাইল দূরের জিনিষও অতি কাছে দেখা যায়। এ কথাটা শুনে তাঁর মনে ভারী কৌতূহল হ'লো। তিনি মনে মনে ভাবলেন যদি কোন রকমে একটা ঐরকম জিনিষ তৈরী

গ্যালিলিও

করে নেওয়া যেত—তাহ'লে কি মজাই না হোত ! তাহ'লে ঘরে বসেই দূর দূরান্তরের জিনিষ দেখা যেতো । একথা ভেবেই তিনি আর কাল খিলস্থ করলেন না—উঠে পড়ে লেগে গেলেন অমূনি একটা জিনিষ তৈরী করবার জন্ত । কিছুকাল গভীর মনোযোগের সঙ্গে চেষ্টা করবার পর তিনি একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করে ফেললেন । তাঁর যন্ত্রটা খুবই শক্তিশালী হোল—ওলন্দাজ ভূদ্রলোকের তৈরী দূরবীক্ষণের চেয়েও অনেক উন্নত ধরণের । তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র দু' মাইল নয়, বহু দূরের জিনিষ—এমন কি আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলো পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যেতো ।

এই যন্ত্র আবিষ্কারের কথা যখন দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো—তখন দেশের বহুলোক—ধনী, গরীব, জ্ঞানী, মুর্থ সবাই ছুটে এলো একবার ওর ভিতর দিয়ে ছুনিয়াটাকে ভাল করে দেখে নেবার জন্ত ।

এই আশ্চর্য্য শক্তিশালী দূরবীনের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিপাত করে গ্যালিলিও এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান পেলেন । রাত্রি কালে ওর ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেলেন । গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি এক নূতনরূপে এসে তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ করলে । যে চন্দ্রকে এতদিন তিনি একখানা উজ্জল থালার

মত মাত্র দেখে আসছিলেন, তারই মধ্যে কত পাহাড়পর্বত, সমতলভূমি এবং বিরাট বিরাট গর্ভ প্রভৃতির সন্ধান পেলেন। আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। পূর্বে আকাশে যেসব তারা তিনি দেখতেন এখন তার চেয়ে অনেক বেশী তারা সেখানে দেখতে পেলেন। কৃত্তিকাপুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন সেখানে সাতটি তারাই শুধু নেই—আরও বহু তারা সেখানে রয়েছে। তিনি তার যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বহু নূতন গ্রহ উপগ্রহ ও তারকার সন্ধান পেলেন। এ সবে সন্ধান এ পর্যন্ত কারও জানা ছিল না। এর ফলে জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক যুগান্তর উপস্থিত হলো।

কিন্তু এইসব আশ্চর্য্য আবিষ্কার করায় তাঁর শত্রুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। তারা এই আবিষ্কারকে মোটেই সন্দেহিত দেখলো না। তারা জনসাধারণের কাছে বলে বেড়াতে লাগলো—ওসর ভূয়ো। যা কিছু এই যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তার কিছুর অস্তিত্বই আকাশে নেই—সবই ঐ যন্ত্রটার একটা কারসাজী মাত্র।

এই যন্ত্রের সাহায্যে নানারূপ পরীক্ষা করতে করতে গ্যালিলিও একদা এক মহান সত্য আবিষ্কার করে ফেললেন।

গ্যালিলিও

সেদিনে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে, আর তারই ফলে দিনরাত্রি হয়। গ্যালিলিও পরীক্ষা করে প্রমাণ পেলেন—সূর্য্য স্থির হয়েই আছে, পৃথিবীই তাকে প্রদক্ষিণ করছে—আর সেই কারণেই দিন ও রাত্রি হচ্ছে। গ্যালিলিও তার পরীক্ষার ফল জনসমাজে প্রচার করে দিলেন। তার এই মত শুনে দেশের ধর্ম্মযাজকের দল একেবারে ক্ষেপে গেলো। কারণ গ্যালিলিও যে মত প্রচার করলেন তা শাস্ত্র-বিরোধী। শাস্ত্রে লেখা আছে “সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।” সুতরাং কেউ যদি এ মত ছাড়া অন্য মত প্রকাশ করে তা হলে তা ধর্ম্ম-বিরোধী নিশ্চয়ই হবে। ধর্ম্ম-যাজকের দল বললেন,—“গ্যালিলিও এই মত প্রচার করায় মানুষ অবিশ্বাসী হয়ে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপর তাঁদের যে নিষ্ঠা ও বিশ্বাস রয়েছে তা হারিয়ে ফেলবে। আর ক্রমে ধর্ম্ম রসাতলে যাবে। ধর্ম্ম-যাজকদের এই উক্তি শুনে একটা ভীষণ ভুলুঙ্গু পড়ে গেলো। সবাই গ্যালিলিওর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। সে সময় ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-যাজকদের প্রতি লোকের অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিলো। এজন্য ধর্ম্ম-যাজকদের প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তি ছিলো খুবই বেশী। তখন প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসে যদি কেউ কোন রকম আঘাত

করতো তবে ধর্ম-যাজকেরা তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

শাস্ত্র-বিরোধী মত প্রচারের জন্য ধর্ম-যাজকের দল তাঁকে অভিযুক্ত করলেন। প্রধান ধর্মগুরু পোপের দরবারে তাঁর বিচার আরম্ভ হলো। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো—
“আপনি যে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন—পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে—এ সম্বন্ধে আপনার কি বলবার আছে—আমরা শুনতে চাই।”

গ্যালিলিও নির্ভীক ভাবে উত্তর করলেন—“আমি যা প্রচার করেছি তা অতি সত্য। কারণ আমি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ পেয়েছি বলেই এরূপ মত প্রচার করেছি। আমি নিজেও একথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে থাকি।”

পুনরায় প্রশ্ন হলো—“জানেন, আপনি এ মত প্রচার করে ধর্মদ্রোহিতার কাজ করেছেন।”

গ্যালিলিও বললেন—“আমি ধর্মদ্রোহিতার কোন কাজই করি নাই—আমি বিজ্ঞানের সেবক—আমি সত্যের পূজারী—সুতরাং আমি সত্য বলে যা বুঝেছি তা-ই প্রচার করেছি।”

বিচারপতি বললেন—“ধর্ম-শাস্ত্রে যা লেখা আছে, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নাই; সুতরাং

গ্যালিলিও

আপনি যদি আপনার মত পরিবর্তন না করেন—তা হলে আপনাকে যন্ত্রে নিষ্পেষিত করে হত্যা করা হবে।”

সত্তর বৎসর বয়স্ক জরাগ্রস্ত বৈজ্ঞানিক বিচারকের উক্তি শুনে শিউরে উঠলেন।

তিনি কতকটা যেন আপন মনেই বলে ফেললেন—
“তা হলে আপনারা যা বলছেন তা-ই সত্যি—সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। আর আমার বিশ্বাসই ভুল।”

তাঁর কথা শুনে বিচারক তাঁকে মুক্তি দিলেন। মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যের সাধক বুঝলেন—তিনি যে কথা বলেছেন তা ত তাঁর হৃদয়ের কথা নয়। এ-ত তিনি প্রাণভয়ে বলে ফেলেছেন। পৃথিবীতে সত্যের উপরে কিছুই নাই—প্রাণ ত সবার মত তাঁরও একদিন যাবে—সুতরাং সে জন্ম সত্যকে পরিত্যাগ করা ভীকৃত্য ছাড়া আর কি!

তিনি এই কথা ভেবেই আবার বলে উঠলেন—
“পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য নয়।”

বিচারক তাঁর এই মন্তব্য শুনে তাঁকে বন্দী করতে আদেশ দিলেন। সবাই বললে, এর শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড নয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

বৃদ্ধ বলে দয়া করে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই দেওয়া হোল। এই মনীষার বরপুত্রের শেষ জীবনটা বড়ই করুণ—

গ্যালিলিও

বড়ই মর্মস্পর্শী। নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাজ-কারাগারে বাস করে তিনি প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠলেন। ক্রমে তাঁর দু'টি চোখ—একদা যার সাহায্যে তিনি বিশ্বের বুকে কত সব নূতন গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা প্রভৃতির সন্ধান পেয়ে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক বিপ্লব উপস্থিত করেছিলেন, সেই দু'টি চোখই দৃষ্টি হীন হয়ে পড়লো। শেষ বয়সে তিনি চোখে আর একেবারেই দেখতে পেতেন না।

এই ভাবে শুধু ধর্ম-যাজকদের গোড়ামীর জন্য সুদীর্ঘ কাল নির্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ থেকে বিজ্ঞানের এই আদিগুরুর এরূপ দুর্দশা হোলো। তাঁর চোখ দু'টি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ায় তিনি অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়লেন। অন্ধ না হ'লে হয়ত তিনি আরও অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞানকে খুবই সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন।

এই সময় জানিনা কেন হঠাৎ ধর্মগুরু পোপের স্মৃতি হোলো। তিনি গ্যালিলিওকে কারামুক্ত করে দিলেন। কারাগার থেকে বেরিয়ে তিনি ফ্লোরেন্স নগরীর উপকণ্ঠে পাহাড়ের ওপরে তাঁর একখানা ছোট কুটির ছিল, সেখানে বাস করতে লাগলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল তাঁর কন্যা দু'টি। তাঁরা খৃষ্ট-পন্থী সন্ন্যাসিনী ছিলেন। এরা ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী এক খৃষ্টীয় মঠের

গ্যালিলিও

অধিবাসিনী ছিলেন। সব সময়ে তাঁরা তাঁদের বৃদ্ধ পিতার 'কাছে থাকতে পেতেন না। মাঝে মাঝে এসে তাঁকে দেখাশোনা করে যেতেন। এতেই এই বৃদ্ধ জ্ঞানী অনেকটা শান্তিলাভ করতেন।

এই সময়ে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি মিল্টন ইটালীতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি ইংলণ্ড থেকে আসার সময় সেখান থেকেই ইটালীর কয়েকজন বিখ্যাত লোকের নিকট পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যে একখানা ছিল গ্যালিলিওর কাছে। মিল্টনের বয়স এই সময়ে অল্প ছিল। তিনি গ্যালিলিওর বাড়ী গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তারপর বহুক্ষণ এই অন্ধ জ্ঞানীর সঙ্গে নানাবিষয়ে আলাপ করলেন এবং পরিশেষে তাঁর চোখ দু'টা দৃষ্টিহীন হওয়ার জ্ঞান সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু অদৃষ্টের কী নিশ্চয়ম পরিহাস—বৃদ্ধ বয়সে মিল্টনও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ফোরেন্সের এই গৃহেই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়।

বহুকাল অতীত হওয়ার পরে এ যুগে তাঁর স্বদেশবাসীরা তাঁদের পূর্বপুরুষের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে শুরু করেছে। নানাভাবে এই জ্ঞান-বীরের স্মৃতি-তর্পণের ব্যবস্থা করে, তারা জগতের লোকের ধন্যবাদ-ভাজন হচ্ছেন।

নিউটন

আকাশ লক্ষ্য করে যদি একটা টিল ছোঁড়া যায় তা'হলে কতকদূর উঠেই টিলটা নীচে মাটিতে পড়ে যায়। কেন এমন হয়, একথা তোমরা কেউ-ই হয়ত জানোনা। একদা এক অতি সাধারণ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই এই জটিল প্রশ্নের সমাধান হয়েছিল।

প্রায় তিন শ' বছর আগের কথা। মহাজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক নিউটন একদিন তাঁর বাগানে বসে বসে বিজ্ঞানের নানা সমস্যার কথা মনে মনে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ টুপ করে গাছ থেকে পাকা একটা আপেল তাঁর সামনে এসে পড়লো। এই অতি সাধারণ ব্যাপারটাই তাঁকে খুব বেশী করে ভাবিয়ে তুললে। এরকম হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যাকে সাধারণ মনে করি—যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা তার মধ্যেই অনেক কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পান। তিনি মনে মনে ভাবলেন—“কেন এমন হয়? আপেলটা ত মাটিতে না পড়ে ওপরের দিকেও যেতে পারতো। তবে তা না গিয়ে মাটিতে এসে পড়লো কেন?” তিনি এই নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন পরীক্ষা করে করে স্থির করলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে—আর সেই শক্তিবলেই পৃথিবী সব জিনিসকে আকর্ষণ করে টেনে একেবারে নিজের

নিউটন

কাছে নিয়ে আসে। এই আকর্ষণী শক্তির তিনি নামকরণ করলেন “মাধ্যাকর্ষণ”।

এ পর্য্যন্ত প্রমাণ পেয়েই যে তিনি ক্ষান্ত হলেন— তা নয়। এ নিয়ে তিনি আরও পরীক্ষা করতে লাগলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি এক আশ্চর্য্য সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাই আপেলটাই গাছ থেকে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে কিন্তু পরীক্ষা করে তিনি প্রমাণ পেলেন যে, আপেল যেমন পৃথিবীর দিকে নেমে আসে; পৃথিবীও তেমনি আপেলের দিকে উঠে যায়। একথা শুনে তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবছো—তা’হলে ভারী মজার ব্যাপার ত! কৈ আমরা ত সে রকম কিছুই দেখতে পাই না। এখানেই ত আমাদের মত সাধারণ লোক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তফাৎ। তারা পরীক্ষা করে করে কত কিছু নূতন নূতন ব্যাপার জানতে পারেন।

যাক্ সে কথা—এখন কথা হচ্ছে এর কারণটা কি? নিউটন বললেন—“এর কারণ ত আর কিছুই নয়। কারণ হচ্ছে উভয়ের মধ্যেই উভয়কে আকর্ষণ করবার একটা শক্তি আছে—আর তারই ফলে এরূপ হওয়া সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়—এতবড় প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র আপেলকে

নিউটন

যে শক্তিতে আকর্ষণ করে টেনে আনছে, আপেলও পৃথিবীকে সেই একই শক্তিতে আকর্ষণ করছে। তা হ'লে এখন এখানে তোমরা আর একটা প্রশ্ন করতে পার—উভয়ের মধ্যে যখন উভয়কে আকর্ষণ করবার সমান শক্তিই রয়েছে—তখন পৃথিবীটাও ত ছুটে আপেলের কাছে যেতে পারতো—তা না গিয়ে আপেলটাই ছুটে পৃথিবীর কাছে যায় কেন? এর উত্তর হচ্ছে—পৃথিবী খুব প্রকাণ্ড জিনিষ বলে আপেল সমান শক্তিতে আকর্ষণ করেও তাকে নিজের কাছে আনতে পারে না। আপেলটা পৃথিবীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র তাই পৃথিবী একই পরিমাণ শক্তিতে টেনে তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে।

পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে আকর্ষণ করবার এই যে শক্তি রয়েছে, তার ফলে পৃথিবীতে সর্বদাই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। উর্দ্ধে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে তোমরা দেখ, সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র কত কিছু রয়েছে। আকাশে ওদের দেখে তোমরা একথাও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাবছো—আকাশটা ত ফাঁকা, তবে কাকে অবলম্বন করে ওরা ওখানে ছলছে! ব্যাপারটা তোমাদের কাছে নিশ্চয় একটা ধাঁধাঁর মত মনে হচ্ছে। তোমরা হয়ত শত চেষ্টা করেও এ ধাঁধাঁর উত্তর বার করতে পারছো না। এর উত্তর কিন্তু খুবই সোজা—অবশ্য যারা জানে তাদের কাছে। প্রত্যেক

নিউটন

জিনিষেরই মধ্যে যে আকর্ষণী শক্তি রয়েছে তারই ফলে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হচ্ছে।

গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু কেন ঘোরে সে কথা তিনি সঠিক ভাবে বলতে পারেন নি। নিউটনই তার কারণ সর্বপ্রথম প্রমাণ করে দিয়ে বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। নিউটন বললেন—“অন্যান্য সকল জিনিষের মত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির মধ্যেও আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। এই আকর্ষণী শক্তির ফলেই একরূপ অদ্ভুত কাণ্ড সম্ভব হচ্ছে।” তিনি এর নাম দিলেন “মহাকর্ষণ”। কথাটা বোধ হয় তোমরা খুব ভাল করে বুঝতে পারলে না। আচ্ছা, ব্যাপারটা একটু খুলেই বলছি।

“চুম্বক” নামে একরকম ধাতব পদার্থ তোমরা নিশ্চয় দেখেছ। একখণ্ড লোহাকে যদি একখণ্ড চুম্বকের কাছে রাখা যায়, তা’হলে লোহার টুকরাটা ছুটে গিয়ে ঐ চুম্বকের গায়ে একেবারে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। আবার লোহার টুকরাটাকে যদি চুম্বক থেকে বেশ একটু তফাতে রাখ, তবে দেখবে যে আর লোহাটা ছুটে গিয়ে চুম্বকের গায়ে লাগছে না, স্থির হয়ে যেখানে ছিল সেখানেই আছে। লোহার টুকরাটাকে আরও কতকটা এগিয়ে নিয়ে রাখলেও হয়ত

নিউটন

সেটা ছুটে গিয়ে চুম্বকের গায়ে লাগে না কিন্তু তা হ'লেও সেটা যেখানে রাখা হয়েছে সে জায়গাটা চুম্বকের আকর্ষণের বাইরে নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে চুম্বকটাকে একটু নাড়ালে পর। চুম্বকটা নাড়ালেই দেখা যাবে যে লোহার টুকরাটাও নড়ছে। শুধু তাই নয় সমান ব্যাসের মধ্যে রেখে চুম্বকটাকে ঘোরাও দেখবে লোহার টুকরাটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আবার ঐ লোহার টুকরাটা যদি চুম্বকের চেয়ে অনেক বেশী গুণ ভারী হয় তা হলে অতি কাছে থেকেও চুম্বক তাকে আকর্ষণ করতে পারে না।

মহাকর্ষণের ব্যাপারটাও হুবহু ঐ রকমই। ধরে নাও, পৃথিবীটা যেন চুম্বক আর ওর মধ্যে চুম্বকেরই মত একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ করবার শক্তি রয়েছে। আর ধর, মানুষের কথা। মানুষের মধ্যেও আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় মানুষ কতটুকু! এই কারণেই মানুষকে পৃথিবী আকর্ষণ করে রাখে কিন্তু মানুষ পৃথিবীকে আকর্ষণ করতে পারে না। বহু চেষ্টা করেও মানুষ ওপরের দিকে উঠতে পারে না। লাফিয়ে ওপরে উঠতে গেলেও উঠতে পারে না, মাটিতে পড়ে যায়। কারণ মানুষ পৃথিবীর এত কাছে রয়েছে যে কিছুতেই তারা পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে যেতে পারে না।

নিউটন

শুক্রে গ্রহের কথা এখন ধরা যাক। ঐ গ্রহটীও পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু তবু পৃথিবী তাকে তার আকর্ষণী শক্তির সাহায্যে নিজের কাছে টেনে আনতে পারে না। তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে, পৃথিবী শুক্র গ্রহ থেকে এতদূরে আছে যে সে যায়গা পর্যন্ত পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি পৌঁছুতেই পারে না।

আবার চাঁদের ব্যাপারখানা দেখ কী রকম। সেও এমন একটা যায়গায় রয়েছে যেখান থেকে তাকে টেনে আনা পৃথিবীর পক্ষে মাত্রই সম্ভব হচ্ছে না। অথচ সে ক্রমাগতই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। তার কারণ আর কিছুই নয়। যে জায়গায় চাঁদটা আছে সে জায়গাটা পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে নয়। তাই পৃথিবী যেমনি সূর্যের আকর্ষণী শক্তি বলে তার চারদিকে ঘুরছে, চাঁদও সঙ্গে সঙ্গে, লোহার টুকরা যেমন চুম্বকের আকর্ষণে ঘোরে, তেমনি ভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে যাচ্ছে। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহগুলিই এই একই নিয়মে চলছে। আর এই মহাকর্ষণের জগুই মহাশূন্যে অবস্থান করেও ওরা কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে পড়ে যাচ্ছে না; একে অপরকে আকর্ষণ করে রাখছে। এই তথ্য আবিষ্কার করে নিউটন বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মহাকর্ষণের

নিউটন

আবিষ্কর্তা হিসেবে আজও সবাই তাঁর পূজা করে থাকে ।

১৬৪২ খৃষ্টাব্দের পঁচিশে ডিসেম্বর, ইংলণ্ডের লিঙ্কন-শায়ারের অন্তর্গত উলস্‌থর্প নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁর জন্ম হয় । এই বৎসরই বিজ্ঞানাচার্য গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়েছিল । সুতরাং এ বৎসরটা বিজ্ঞান-জগতে দুইদিক থেকেই স্মরণীয় হয়ে আছে ।

খুব বড়লোকের ঘরে নিউটনের জন্ম হয় নি । তাঁর পিতা ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত কৃষক । নিউটনের জন্ম হওয়ার তিন চার মাস পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল । জন্মের পর তাঁর কৃশ ও দুর্বল আকৃতি দেখে সবাই ভেবেছিল যে, এ ছেলে বেশী দিন বাঁচবে না । ছেলের যাতে খুব ভালো যত্ন হয় এজন্য মা দু'জন ধাত্রী রেখে নিলেন । এদের অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার ফলেই বালক ক্রমে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলো ।

বাল্যকালে নিউটনকে দেখে কেউই মনে করতে পারে নি যে, কালে তিনি একরূপ অদ্ভুত মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞ বলে পরিচিত হতে পারবেন ।

কোন বিশেষ কারণে নিউটনের প্রতিপালনের ভার পড়েছিল তার দিদিমার ওপর । তিনি তাঁর যত্নও নিতেন

নিউটন

যেমনি, তেমনি তাঁকে ভালও বাসতেন খুব বেশী। একটু বয়স হলে তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হোল। পাঠশালার ছাত্র হিসেবেও তিনি খুব বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি ঐ বয়সেই কারিগরী কাজে এমন সব আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিতে লাগলেন যা তার বয়সের ছেলের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তিনি সর্বদাই শুধু হাতুড়ী, বাটালী, করাত ইত্যাদি যন্ত্রপাতি নিয়েই থাকতেন। পাঠশালার ছুটির পর অগ্ৰাণ্য ছেলেরা যখন খেলাধুলো গল্পগুজব নিয়ে মত্ত, তখন নিউটন বসে বসে নিবিষ্ট চিত্তে যন্ত্রপাতি দিয়ে নানারকম চমৎকার সব জিনিস তৈরী করতেন। জিনিসগুলো হতোও আবার এমনি চমৎকার যে সবাই একবাক্যে সেগুলোর প্রশংসা করতো। এসব দেখে তার দিদিমা ভাবতেন—কালে তাঁর নাতি একজন ভারী নামজাদা মিস্ত্রী হবে আর এইসব জিনিস তৈরী করে যথেষ্ট টাকা পয়সাও উপার্জন করবে। কেউ তখন অনুমান পর্য্যন্ত করতে পারে নি যে, এই সব সাধারণ উদ্ভাবনী-শক্তির আড়ালে ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার বীজ লুকিয়ে লুকিয়ে অঙ্কুরিত হচ্ছে।

দিদিমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা নিউটনের এইরকম উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে বললেন

নিউটন

—কোন ঘড়ী-প্রস্তুতকারীর কাছে নিউটনকে 'শিক্ষানবীশ' হিসেবে কাজ শেখার জন্ত পাঠাতে। এর একটু কারণও ছিল—এরই মধ্যে নিউটন চমৎকার রকমের একটা জলঘড়ী তৈরী করে ফেলেছিলেন। ঘড়ীটাকে কোন কলকজার সাহায্যে চালাতে হতো না। এ চলতো শুধু জলের সাহায্যে। এজন্যই এর নাম দেওয়া হয়েছিল জল-ঘড়ী। ঘড়ীটা সময়ও দিতো খুব ঠিক।

বাল্যকাল থেকেই নিউটনের এক একটা অতি কঠিন বিষয়েরও সহজ সমাধান করার শক্তি ছিল। এবং ভবিষ্যতে তাঁর এই শক্তি আরও বেড়ে গিয়েছিল। কোন্ বাতাসের গতিবেগ কেমন—তার ভারী ইচ্ছা হোল এ রহস্যের তিনি একটা সমাধান করেন। শুধুমাত্র বাতাসের গতির বিপরীত দিকে লাফিয়ে, তিনি এ রহস্যের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করে ফেললেন। শুধু মাত্র ঐভাবে লাফ দিয়েই তিনি ঠিক করতে পারতেন—কখন মৃদু সমীরণ, কখন সাধারণ বাতাস আর কখন ঝড় বইছে। বাল্যকাল থেকেই নিউটন শুধুমাত্র এইরকম খেলাধুলোর ছলে প্রকৃতির নানা রহস্যের সমাধান করে যাচ্ছিলেন।

পাঠশালার পড়া শেষ হবার আগেই নিউটনের মা তাকে দিদিমার বাড়ী থেকে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন—

নিউটন

এখন তার কৃষির কাজ শিখতে হবে। এ বয়সে এ কাজ শিখে না নিলে বড় হয়ে সে পৈতৃক ক্ষেত খামার রক্ষা করবে কি করে? নিউটনের কিন্তু মায়ের উপদেশটা খুব ভালো লাগলো না। ভবিষ্যতে যিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হবেন, তাঁর কাছে এ কাজ ভাল না লাগারই ত কথা। মা একজন বুড়ো চাকরকে সঙ্গে দিয়ে তাঁকে ক্ষেতের ফলমূল শাকসব্জী বেচবার জন্য হাতে পাঠিয়ে দিতেন। নিউটন করতেন নাকি চাকরকে হাতে জিনিষ বেচতে পাঠিয়ে, নিজে পথের মধ্যে গাছতলায় বসে বসে গণিত শাস্ত্রের বই পড়তেন। মা পাঠাতেন তাকে ক্ষেতে মজুরদের কাজ দেখতে—তিনি কাজ দেখবেন কি ক্ষেতের পাশে বই নিয়ে বসে বসে তাই পড়তেন। দিন নেই রাত্রি নেই শুধু পড়া আর পড়া। ছেলের এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় পেয়ে ক্রমে মা-ও তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন—ভবিষ্যতে এ ছেলে খাবে কি করে?

গণিত-শাস্ত্রের প্রতি নিউটনের এরূপ অদ্ভুত নিষ্ঠা লক্ষ্য করে, সকলেই তাঁর মাকে বললে—“এ ছেলেকে দিয়ে ক্ষেতের কাজকর্ম কিছু চলবে না। একে কোথাও আবার পড়তে পাঠিয়ে দাও।” সে সময় ইংলণ্ডে গণিত-শাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র

নিউটন

ছিল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে সেখানে গিয়েই তিনি ভর্তি হলেন।

এখানে ভর্তি হয়েই তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হোলো। তিনি এখানে আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন। কতককাল গবেষণা করবার পর তিনি আশ্চর্য্য এক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন। তিনি বললেন—সূর্যের আলোক এমনি সাদা বলে মনে হলেও—ওর মধ্যে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ আছে। তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রমাণও করে দিলেন। আলোকের এই রহস্য এমনি বোঝা না গেলেও—তে-শিরা কাঁচের (Prism) সাহায্যে সূর্যের রশ্মি বিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটা অতি সহজেই বোঝা যেতে পারে। এ ব্যাপারটা তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পার। ঝাড় লঠনের সঙ্গে যে তিন কোণাওয়াল কাঁচের কলম থাকে তারই একটা কলম সূর্যের আলোর মধ্যে ধরে দেখো, দেখবে কেমন সুন্দর সাতটি বর্ণ সূর্যের আলোকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে নিউটন যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন—তা-ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক অভিনব বস্তু। এ ছাড়া নিউটন গণিত ও জ্যামিতির বহু নূতন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করে গণিত ও জ্যামিতিকে বিশেষরূপে

নিউটন

সমৃদ্ধ করলেন। এই সব সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতিতে দেশ ভরে উঠলো।

এই সময়ে কেম্ব্রিজ সহরে ছরন্তু প্লেগরোগ মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যান্য সকলের মত নিউটনও এই কারণে কেম্ব্রিজ পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরে আসেন। বাড়ী এসে তাঁর খুবই অসুবিধা হতে লাগলো। এখানে পড়বার জন্ম না পেতেন বই, না পেতেন কোন অধ্যাপকের সাহায্য। তবুও তিনি আপন ভাবে বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। এই সময়েই তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মহাকর্ষণের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন। সে সম্বন্ধে পূর্বেই তোমাদের বলেছি।

যা হোক মহামারীর প্রকোপ বন্ধ হয়ে গেলে, তিনি আবার কেম্ব্রিজে ফিরে গেলেন। তাঁর এই সমস্ত অভিনব আবিষ্কারের বিষয় বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে গবেষণা কার্যে উৎসাহ দেওয়ার জন্ম বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল গবেষণা করে তিনি আরও অনেক নূতন তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন।

এই সময়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক পদত্যাগ করেন। এই পদে নিউটনকে নিযুক্ত করা হোল। তিনি যে শুধু আবিষ্কর্তা হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন

নিউটন

তা নয়, তাঁর অধ্যাপনার রীতিও ছাত্রদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

১৬৭১ খৃষ্টাব্দে নিউটনকে বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ সমিতি রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত করা হয়। নিয়ম আছে যে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক সভ্যকে এক শিলিং করে চাঁদা দিতে হবে। তখন নিউটনের আয় অতি অল্প ছিল—সুতরাং প্রতি সপ্তাহে তিনি ঐ চাঁদা দিয়ে উঠতে পারতেন না। যা আয় হতো তা পরিবারবর্গের ভরণপোষণেই ব্যয় হয়ে যেত। এইজন্য সমিতির সভ্যরা স্থির করলেন যে, নিউটনকে কোন চাঁদা দিতে হবে না। তাঁরা বললেন,—চাঁদা দিতে না পারার জন্য নিউটনের মত জ্ঞানীর নাম সভ্য-তালিকা থেকে উঠিয়ে দেওয়া যায় না।

আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকার দরুণ নিউটন যে খুব ক্ষুণ্ণ ছিলেন তা নয়। কারণ তিনি ছিলেন সত্যিকার জ্ঞানী। জ্ঞানের চর্চাতেই তিনি আনন্দ পেতেন—অর্থলিপ্সা তাঁর মাত্রই ছিল না।

নিউটনের বন্ধুরা তাঁর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা সর্বদাই ভাবতেন। তাঁরা ভাবতেন যে, নিউটনের আয় বৃদ্ধি না পেলে তিনি নির্বিঘ্ন চিন্তে বিজ্ঞানের সেবায় মনোনিবেশ করতে পারবেন না। এই কারণেই তারা তাঁর

নিউটন

আর্থিক অনটন দূর করবার জন্ত সর্বদাই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। টাকশালের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায় এই সময়ে এক সুযোগ মিলে গেলো। এই পদে তাঁকে নিযুক্ত করবার জন্ত সকলেই বাস্তু হয়ে উঠলেন এবং সকলের সাহায্যে তিনি ঐ পদ পেলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। টাকশালের অধ্যক্ষরূপে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং একাজে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, আজ পর্যন্ত টাকশালের অপর কোন অধ্যক্ষের পক্ষে সেরূপ খ্যাতি অর্জন করা সম্ভব হয় নি। ১৭২৭ সালের ২০শে মার্চ প্রায় চৌরাশী বৎসর বয়সে নিউটনের মৃত্যু হয়।

তিনি পরম পণ্ডিত হয়েও বিনয়ের অবতার ছিলেন। একরূপ বিনয়ী ব্যক্তি সে সময়ে খুবই অল্প দেখা যেতো। একদা তিনি বিনয় প্রকাশ করে বলেছিলেন—“সম্মুখে জ্ঞানের সীমাহীন সমুদ্র—তারই তীরে দাঁড়িয়ে আমি— নিতান্তই বালকের মত—শুধু পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে যাচ্ছি।” একরূপ কথা তাঁর মত পরম জ্ঞানীর মুখেই শুধু শোভা পায়।

আকাশের আলো

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা—তখন কোন এক দেশে বাস করতো একটা মেয়ে। নাম তার চপলা। শ্বেতপদ্মের কুঁড়ির মতই শুভ্র সুন্দর সে।

দেশের পাশ দিয়ে বয়ে যায় ছোট্ট একটা নদী—কুলু কুলু রবে—তিরু তিরু করে। তার-ই তীরে আপন মনে খেলে বেড়ায় চপলা। নদীর তীরেই বন। বন থেকে সে ফুল কুঁড়িয়ে এনে গাঁথে মালা। আপন মনে ঐ গাঁথা মালা গলায় পুরে, আবার কি ভেবে খুলে ফেলে দেয়। এমনি ভাবেই আনন্দে চপলার দিনগুলো যায় কেটে। একদিন সেই পথে দেবরাজ ফুলরথে চড়ে কোথায় যান। সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়লো ঐ চপলারই দিকে। দেবরাজ হলেও অমন সুন্দর মেয়ে তাঁর চোখে তখনও পড়েনি।

তিনি রথ থামিয়ে নেমে এলেন তার কাছে। বললেন—“আমায় বিয়ে করবে? আমি তোমায় স্বর্গের রাণী করবো।”

চপলা কোন বন্ধনেই ধরা দিতে রাজী নয়—সে আপন মনে নদীর তীরে তীরে বসন্তের হালুকা বাতাসের মত খেলা করে, বনে বনে ফুল কুঁড়িয়ে, আর সেই ফুলে মালা গেঁথেই জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। সুতরাং সে দেবরাজের কথায় রাজী

আকাশের আলো

হোল না। দেবরাজ কিন্তু তার কথা শুনলেন না। তাকে জোড় করে রথে তুলে নিয়ে স্বর্গে চলে এলেন।

স্বর্গে এসে চপলার মনে আর সুখ নেই, নাওয়া খাওয়া নেই—শুধু বসে বসে কাঁদে আর কাঁদে। দেবরাজের পায়ে ধরে সে কত কঁাদলো, কত মিনতি করলো—তাকে তার দেশে ফিরিয়ে পাঠাতে। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনলেন না—একেবারে অচল অটল হয়ে রইলেন।

চপলার না খেয়ে খেয়ে দিন দিন শরীর শুকিয়ে যেতে লাগলো। তার পূর্বের সে শ্রী ঘুচে গেলো। তবু দেবরাজের দয়া হলো না।

কিন্তু চপলার দুঃখ দেখে আকাশের মেঘদের হলো ভারী দয়া। দেবরাজ আর যাতে কখনও তার দেখা না পান—কারণ দেখতে পেলেই আবার তাকে বন্দী করবেন, এজন্য তারা করলে না কি তাকে তাদের পেছনে এনে লুকিয়ে রাখলে। দেবরাজ আর তার দেখা পেলেন না।

সেই থেকে চপলা মেঘের আড়ালে আড়ালেই ঘুরে বেড়ায়—আর দেবরাজকে দেখলেই খিল্ খিল্ করে ওঠে হেসে। দেবরাজ তাকে ধরতে না পেরে আক্রোশে গর্জন করে ওঠেন। সেই থেকে চিরদিন এমনি ধারাই চলেছে। মেঘলা আকাশের বুকে তোমরা যে আঁকাবাঁকা আলোক-রেখা

আকাশের আলো

দেখতে পাও তা-ই চপলার হাসি, আর দেবরাজ যখন গর্জন করেন তখন তোমরা তাকে বজ্রের হুঙ্কার বলে মনে কর ।

গল্পটা শুনে অবধি তোমরা হয়ত আমার ওপর মনে মনে ভারী চটে গেছ । হয়তো বলছো—ওসব বাজে কথা রেখে দিন । আজকাল আর আপনার এসব গালগল্পে কেউ বিশ্বাস করবে না । মেঘলা আকাশের বুকে যে আলোক রেখা দেখা যায়—সে হচ্ছে বিদ্যুৎ । ওখানে আবার কোন মানুষ আছে নাকি যে খিল্ খিল্ করে হাসবে । আর যদিই বা কেউ ওখানে থেকে হাসেও তবে তা থেকে আলোকেরই বা সৃষ্টি হবে কেন ?

আজ হয়ত অতি সহজেই তোমরা বলে ফেললে ও জিনিষটা বিদ্যুৎ । কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন লোকে এ রকম গল্প বিশ্বাস করতো । শুধু কি এ ধরনের এই একটা গল্পই প্রচলিত ছিল ? না তা নয় । কেউ মেঘলা আকাশের এই ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানী’কে বলতো—ক্রুদ্ধ হয়ে স্বর্গ থেকে দেবতারা আমাদের শাসন করছেন । আবার কেউ কেউ বলতো স্বর্গে দেবতা ও অশুরে যুদ্ধ হচ্ছে, আর দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ছুঁড়ে অশুরদের হত্যা করছেন । এই রকম আরও কত কি ! কিন্তু কালক্রমে একদিন মানুষ তার ভুল বুঝতে পারলো, তখন তার মনে প্রকৃতির

আকাশের আলো

এই রহস্যের একটা সত্যিকার সমাধান করবার ইচ্ছা হলো।

এইখানে গোড়ার কথা একটু বলে নিলে গল্পটা তোমাদের বোঝবার পক্ষে সুবিধে হবে। বিদ্যুৎ বলে যে একটা জিনিষ আছে,* একথা অনেক দিন থেকেই লোকের জানা ছিল।

চক্‌মকি নামে এক রকম পাথর আছে। এই পাথরের গুণ হচ্ছে এই, যে, যদি এর একটা টুকরো খুব জোরে কোন কঠিন জিনিষে ঘষা যায়, তা হলে এ থেকে এক রকম আগুনের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বল্টিক সাগরের তীরে আর এক রকম হল্‌দে রঙের পাথর দেখা যায়। এ পাথরের নাম অ্যাম্বার (Amber)। সে পাথরও চক্‌মকি পাথরেরই মত। সে পাথরও কোন কঠিন জিনিষে ঘষলে তা থেকে আগুন বেরোয়। প্রাচীন সময়ে গ্রীস দেশের লোকেরা এই পাথরের গুণের কথা জানতেন। গ্রীক ভাষায় অ্যাম্বার পাথরকে বলে “ইলেকট্রন”।* এই ইলেকট্রন শব্দ থেকেই ইংরিজী “ইলেকট্রিসিটি” শব্দটা এসেছে।

* আজকাল ইলেকট্রন বলে অণু জিনিষ বোঝায়। সে বিষয়ে মাদাম কুরীর গল্পে আলোচনা করা হয়েছে।

আকাশের আলো

মেঘলা আকাশের বুকে হঠাৎ যে আঁকা বাঁকা অতি উজ্জ্বল আলোক রেখা সৃষ্টি হয় তা-ও যে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ শ্রেণীরই একটা পদার্থ একথা বহুদিন পর্যন্ত মানুষ জানে নি। মাত্র কিছুকাল পূর্বে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এ সত্য প্রমাণ করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের কাহিনীটাও ভারী অদ্ভুত।

অ্যান্ডার (Amber) পাথর ঘষবার ফলে যে বিদ্যুৎ তৈরী হয়—আর বর্ষার মেঘলা আকাশে যে তীব্র আলোক রেখা দেখা যায়—এই উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। যেমন—উভয় আলোকেরই গতি আঁকা বাঁকা, উভয় আলোকই জলে উঠবার সময় পরিমাণে খুব বেশী হলে অনেক সময় শব্দ হয়, উভয় আলোকেরই পোড়াবার ক্ষমতা আছে। এই রকম আরও সব। এ সব লক্ষ্য করেই বৈজ্ঞানিকদের মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল যে, তা হলে আকাশের ঐ আলোক রেখাও হয়ত বা বিদ্যুৎ। এদের মধ্যে ফ্রাঙ্কলিনও একজন। তিনি তাঁর সন্দেহটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করবার জন্য অদ্ভুত এক উপায় বার করলেন।

তিনি চিন্তা করে স্থির করলেন, উভয় আলোক সত্যি সত্যি একই পদার্থ কিনা তা পরীক্ষা করতে হলে আকাশের

আকাশের আলো

আলোককে হাতের মুঠোর মধ্যে না পেলে কি করে আর পরীক্ষা চলতে পারে! সুতরাং এ আলোককে আকাশ থেকে নামিয়ে আনতে হবে।

এইখানে তোমাদের আর একটা কথা জেনে নেওয়া দরকার।—বিদ্যুৎ জিনিষটা সব জিনিষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। কোন কোন জিনিষের মধ্য দিয়ে অতি সহজেই প্রবাহিত হয়, যেমন—তামা। আবার কোন কোন জিনিষ আছে যার ভিতর দিয়ে একেবারেই প্রবাহিত হতে পারে না, যেমন—রেশম।

ফ্রাঙ্কলিন স্থির করলেন যে, মেঘের রাজ্যে একদিন একটা ঘুড়িকে উড়িয়ে দিয়ে তারই সাহায্যে সেখান থেকে বিদ্যুৎকে ধরে আনবেন। যেই কথা সেই কাজ। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে আকাশে মেঘের জন্ম অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কয়েকদিন অপেক্ষা করবার পর, একদিন মেঘে মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে—জোরে বইতে লাগলো হাওয়া। ফ্রাঙ্কলিন পূর্বেই একখানা রেশমের ঘুড়ি তৈরী করে রেখেছিলেন। সেখানা হাতে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সেই পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে ঘুড়ি ওড়াবার জন্ম বেরুতে দেখে ছেলের দল একেবারে ক্ষেপে গেলো। তারা তাঁর পেছনে

আকাশের আলো

পেছনে ছুটলো কোতূহলী হয়ে হৈ চৈ করতে করতে ।
এতে তিনি মাত্রই ক্রম্পন করলেন না ।

তিনি মাঠে এসে ঘুড়ির সঙ্গে প্রথমেই একখণ্ড তামার তার বেঁধে নিলেন । তারপর ওড়াবার জন্তু ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধলেন পাটের শক্ত লম্বা সূতো । যে জায়গায় সূতোটা তাঁর হাতে থাকবে—সেখানটায় সূতোর পরিবর্তে রেশমের ফিতে বাঁধা হলো । আর সূতো ও রেশমের গাঁঠ যেখানে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে বাঁধলেন একটা ধাতুর তৈরী চাবী । এই সমস্ত ঠিকঠাক করে তিনি বসে রইলেন ।

আকাশে কিছুকালের মধ্যেই বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হলো । অমনি তাড়াতাড়ি করে তিনি ঘুড়িখানা উড়িয়ে দিলেন । দেখতে দেখতে জোর বাতাসে ঘুড়ি একেবারে উঠলো গিয়ে মেঘের রাজ্যে । সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎও ঘুড়ির ওপর দিয়ে ঝলক দিয়ে গেলো । কিন্তু কিছুই হলো না । ব্যাপার দেখে তিনি একেবারে দমে গেলেন । মনে মনে ভাবলেন—তাহলে তিনি যা সন্দেহ করেছেন তা কি মিথ্যা । যদি আকাশের ঐ আলো সত্যি সত্যি বিদ্যুৎ হয়ে থাকে তবে ঘুড়ির সূতোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নীচে না নেমেই পারবে না । কারণ বিদ্যুৎ তার বাহনকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়, এ-ত একেবারে বহু-পরীক্ষিত সত্য ।

আকাশের আলো

এই কারণেই তিনি ঘুড়ির সঙ্গে তামার তার বেঁধে দিয়েছিলেন।

পূর্বেই তোমাদের বলেছি যে, তামার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ অতি সহজে প্রবাহিত হয়। তামার তার ও পাটের সূতোর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ নেমে এসে ধাতু নির্মিত চাবীর মধ্যে ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করবে। আর যাতে সূতোর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ নেমে এসে সরাসরি তাঁর শরীরে ঢুকে মাটিতে প্রবেশ করতে না পারে এজন্য গোড়ায় রেশমের ফিতে বেঁধে নিয়েছিলেন। তোমরা জানো যে, রেশমের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না। এই সব কারণেই তিনি ঘুড়ির সঙ্গে নানা রকম জিনিষ জুড়ে দিয়েছিলেন। যাক সে কথা—আবার ঘুড়ির ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ বালক দিয়ে গেলো। এবারে ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধা সূতো একেবারে শক্ত হয়ে নড়তে শুরু করলো। তিনি ব্যাপার দেখে কম্পিত হৃদয়ে চাবীটাকে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলেন। স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিদ্যুতের ফুলিঙ্গ লাফিয়ে পড়লো। এই সময়ই আবার শুরু হলো বৃষ্টি। সূতো জলে ভিজ্জে গেলো। যতক্ষণ সূতো শুকনো ছিল ততক্ষণ ওর ভিতর দিয়ে ভালো করে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে নি। সূতো ভিজ্জবামাত্রই ওর মধ্য দিয়ে জোরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত

• আকাশের আলো

হতে শুরু করলো। ফ্রাঙ্কলিন আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। আজ তাঁর জীবনের শুভ দিন। আজ তিনি এক মহাসত্য আবিষ্কার করেছেন।

ফ্রাঙ্কলিন আরও নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তাঁর সন্দেহই সত্য। মেঘলা আকাশের ~~কোন~~ যে তীব্র আলোক-রেখা দেখা যায় তা বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই থেকেই তিনি প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত জিনিষেই কম বা বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। ঘন্টার ফলে প্রত্যেক জিনিষ থেকেই কম বা বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। আকাশে দুই খণ্ড মেঘ যখন পরস্পর বিপরীত দিক থেকে ভাসতে ভাসতে একে অপরের সঙ্গে এসে প্রবল বেগে ধাক্কা খায়, তখনই এই আলোক রেখা উৎপন্ন হয়।

এইরূপে ঘুড়ির সাহায্যে প্রকৃতির অসীম রহস্যের কতটুকু সমাধান করে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা করে করে ফ্রাঙ্কলিন এ সম্বন্ধে আরও বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। আজকাল বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষ অসম্ভবকে যে সম্ভবে পরিণত

আকাশের আলো

করতে সক্ষম হচ্ছে তার আরম্ভ হয়েছিল এই ফ্রাঙ্কলিনের হাতেই। অবশ্য পরে আরও নানাভাবে নানাভাবে এর আরও অনেক উন্নতি করে গিয়েছেন এবং এখনও পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে গবেষণা করে করে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করছেন।

ফ্রাঙ্কলিনের জন্ম হয়েছিল দরিদ্রের ঘরে। তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা শুধু তাঁর নিজের চেষ্টায়। তিনি যে শুধু বৈজ্ঞানিকই ছিলেন তা নয়, তিনি দার্শনিক এবং তাঁর স্বদেশের একজন নেতাও ছিলেন। তিনি তাঁর স্বদেশের উন্নতির জন্তও নানাভাবে চেষ্টা করে গিয়েছেন।

দাতা নোবেল

নোবেল পুরস্কারের কথা তোমরা অতি অবশ্য শুনেছ। আমাদের দেশের দু'জন মনীষী এই পুরস্কার লাভ করে, জগতবাসীর কাছে আমাদের দেশের মর্যাদা বিশেষরূপে বৃদ্ধি করেছেন। এঁদের দু'জনের নামই তোমরা হয়ত জানো। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদেরই বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ। এঁর কবিতা তোমরা নিশ্চয় পড়েছ। ইনি এঁর অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছেন। আর অপর জন বৈজ্ঞানিক। এঁর নাম স্মর চন্দ্রশেখর বেক্ট রামণ। ওঁর বাড়ী মাদ্রাজে। বিজ্ঞানের একটা মৌলিক আবিষ্কারের জন্য ইনি এই পুরস্কার পেয়েছেন। এঁর আবিষ্কার-কাহিনী ও জীবনী এ বইয়েরই শেষের দিকে আছে। তা পড়লেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবে।

নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে হয়ত তোমাদের অনেকেরই খুব সুস্পষ্ট ধারণা নেই। সুইডেনে একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর নাম এলফ্রেড নোবেল। তিনি ব্যবসা করে অগাধ অর্থ অর্জন করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর অর্জিত সম্পত্তির অধিকাংশই (কয়েক কোটি টাকা দাম হ'বে) জাতিধর্ম নিৰ্বিশেষে প্রত্যেককে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়

দাতা নোবেল

উৎসাহ দেওয়ার জন্য, একটি সমিতি গঠন করে তার হাতে দিয়ে গিয়েছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ধর্মাবলম্বী লোকই যোগ্যতা থাকলে এই পুরস্কার পাবার অধিকারী হতে পারবে। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা কৃষিবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং বিশ্বে শান্তি স্থাপন— এই পাঁচটি বিভিন্ন বিষয়ে যারা নূতন কথা কিছু শোনাতে পারবেন—তঁরাই এই পুরস্কার পাবার অধিকারী হবেন। অবশ্য পুরস্কার দেওয়ার চূড়ান্ত মীমাংসার ভার নোবেল যে সমিতির হস্তে টাকা গচ্ছিত রেখে গেছেন—সেই সমিতিরই ওপরে। আমাদের দেশের টাকায় এর প্রত্যেকটি পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার। যদি কোন বিষয়ে কোন বৎসর কাকেও পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে ঐ সমিতি বিবেচনা না করে তা হ'লে সে বিষয়ের পুরস্কার আর ঐ বৎসর দেওয়া হয় না। আবার একই বৎসরে একই বিষয়ে দু'জনকে যোগ্য বলে বিবেচনা করলে, দু'জনের মধ্যে পুরস্কারের টাকাটা ভাগ করে দেওয়া হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই এই অগাধ সম্পত্তির দাতা এলফ্রেড নোবেলের পরিচয় জানবার জন্য খুব কৌতূহল বোধ করছো। এমন মহৎ হৃদয় লোকের কথা জানবার জন্য সবারই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

দাতা নোবেল

নোবেল ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার এবং রাসায়নিক। ডিনামাইটের নাম তোমরা শুনে থাকলেও থাকতে পার। ডিনামাইট এক প্রকার ভীষণ বিস্ফোরক। পাহাড়, পর্বত, গ্রাম, সহর সব কিছুই এর সাহায্যে একদম উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেতে পারে। এমনি ভীষণ শক্তিশালী ও মারাত্মক এই জিনিষটি। এই জিনিষটিই আবিষ্কার করেছিলেন এলফ্রেড নোবেল।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এলফ্রেড নোবেল এই অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারটি করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে, সে সময়ে জগতে একটা বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

ডিনামাইট আবিষ্কারের ফলে পাহাড় পর্বত উড়িয়ে, তার ভিতর দিয়ে, রেলপথ তৈরী করবার খুবই সুবিধা হয়েছে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এক দেশ থেকে আন এক দেশে যাবার জন্য যে টানেল বা সুড়ঙ্গ তৈরী করে, রেলপথ বসান হয় সে কথা তোমরা হয়ত শুনে থাকবে। এবং কেউ কেউ হয়ত, এই সুড়ঙ্গ বা টানেল দেখেও থাকবে। আমাদের দেশে আসামের কয়েক জায়গায় এই রকম টানেল আছে। তা ছাড়া গয়া, জামালপুর, হরিদ্বার প্রভৃতি আরও অনেক জায়গায় টানেল দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্বে পাহাড়-পর্বতের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরী করা— বিশেষ করে রেলপথের জন্য সুড়ঙ্গ তৈরী করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। যদি কোদাল বা শাবল দিয়ে পাথর কেটে কেটে পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে হয় তা হলে তা বুঝতেই পার কেমন পরিশ্রম—আর কত সময়ের দরকার। এরকম ভাবে পাথর কেটে কেটে রাস্তা তৈরী করা একরকম অসম্ভব বললেও চলে।

পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছাড়া যে সব দেশে যাওয়ার আর কোন উপায়ই ছিল না—এখন এই টানেল তৈরী করবার ফলে রেলগাড়ীতে চড়ে অতি অনায়াসে সে সব দেশে যাওয়া যেতে পারে। আজ যদি মানুষ ইচ্ছা করে যে, হিমালয়ের ওপর দিয়ে সোজা চীনে যাওয়ার জন্য রেলপথ তৈরী করবে তাহলেও খুব বেশী অসুবিধায় পড়তে হবে না। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করে নিলেই হলো।

ডিনামাইট আবিষ্কার হওয়ার ফলে, কামান, বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধ করবার অস্ত্রগুলিরও খুব উন্নতি করা সম্ভবপর হয়েছে। এর সাহায্যে বন্দুক ও কামানের গোলাগুলী বহু দূরে ছুঁড়ে দেওয়া যায়। এইজন্য আজকাল বহু দূরে থেকেও দুই দল শত্রু অতি অনায়াসে যুদ্ধ করতে পারে। পূর্বে সে

দাতা নোবেল

সুবিধা ছিল না। পূর্বে যুদ্ধ করতে হোত কাছে কাছে থেকে। একদল সৈন্য আর একদলের কাছে এগিয়ে না আসলে যুদ্ধ করা সম্ভব হোত না, কারণ অস্ত্র ছুঁড়ে খুব বেশী দূরে পাঠানো সম্ভব ছিল না। আজকাল ডিনামাইটের চেয়েও মারাত্মক অতি ভীষণ ভীষণ নানারকম সব যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সত্য : কিন্তু তা হলেও ডিনামাইটের ব্যবহার একটুকুও কমে নি।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের একুশে অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহল্‌মে এলফ্রেড নোবেলের জন্ম হয়। ইনি ছিলেন এঁর পিতার তৃতীয় পুত্র। বাল্যকাল থেকেই ইনি খুব রোগা ছিলেন। এজন্য এঁর বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ বড় একটা ঘটে নি। তিনি ছেলেবেলায়ই তাঁর বাবার সঙ্গে রাশিয়ার রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গে চলে আসেন। এখানে তাঁর বাবার ছিল একটা টরপেডো তৈরীর কারখানা। টরপেডো কাকে বলে তোমরা সকলে হয়ত জানেনা। এ-ও একরকম যুদ্ধে ব্যবহার করবার অস্ত্র। জল-যুদ্ধেই এ জিনিষটার ব্যবহার হয়ে থাকে। সংকীর্ণনে যে মৃদঙ্গ বাজান হয়, সেই মৃদঙ্গেরই মত একরকম ধাতুর খোল তৈরী করে তার মধ্যে বারুদ পূরে এ জিনিষটা তৈরী করা হয়। এই মারাত্মক অস্ত্রটা জলের নীচ দিয়ে অতি বেগে

দাতা নোবেল

ছুটে যেতে পারে। জাহাজ ইত্যাদি ধ্বংস করবার কাজেই এ অস্ত্র ব্যবহার হয়ে থাকে।

নোবেল বাল্যকালে তাঁর বাবার এই টরপেডোর কারখানায় এইসব অস্ত্র তৈরীর কাজ শিখতেন। কিছুকাল সেখানে কাটবার পর নোবেলের বাবা তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের ওপর এই কারখানার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে দেশে ফিরে এলেন। নোবেলকেও নিয়ে এলেন সঙ্গে করে।

দেশে ফিরে নোবেল বিস্ফোরক পদার্থ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন। নাইট্রোগ্লিসিরিন নামে এক রকম ভীষণ বিস্ফোরক ইতি পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ জিনিষটাও অতি ভীষণ মারাত্মক। কখন যে কি একটা ভীষণ কাণ্ড এ জিনিষটা ঘটিয়ে বসে কিছুই বলা যায় না। তাই এ জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় ভারী সতর্পণে। তিনি এই ভীষণ জিনিষটা নিয়েই পরীক্ষা করতে শুরু করলেন।

পরীক্ষা করে নোবেল বুঝলেন যে, নাইট্রোগ্লিসিরিন খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরক। কিন্তু তরল বলে এ জিনিষটা কোন রকম বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহার করবার নানারকম বিপদ রয়েছে। সকল সময়ই জিনিষটাকে বোতলের মধ্যে পুরে রাখতে হয়। যদি কোনক্রমে

দাতা নোবেল

বাইরে আসতে পারে তা হলে যে কি অর্নিষ্ঠ করে বসবে তা বলা যায় না। এজন্যই একে কি করে কাজে লাগাবার উপযোগী করে নেওয়া যায়, সেই নিয়ে তিনি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন ঘটে গেলো একটা অভাবনীয় কাণ্ড। যার ফলে নোবেল আবিষ্কার করে বসলেন ঐ অতি প্রয়োজনীয় মারাত্মক ডিনামাইট !

ঘটনাটা এই রকম—একদিন কাজ করবার সময় নোবেলের একজন সহকারীর হাত থেকে ফস্কে একটা বোতল হ'তে অনেকটা নাইট্রোগ্লিসিরিন বালির ওপরে পড়ে যায়। লোকটা ব্যাপার দেখে ত ভয়েই একেবারে অস্থির! সে মনে মনে ভাবলে এখনই হয়ত একটা এমন বিস্ফোরণ হবে যার ফলে পরীক্ষাগারের বাড়ীঘর একেবারে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই কথা ভেবেই সে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। নোবেল ছিলেন কাছেই। তিনি ছুটে এলেন। ব্যাপার দেখে তিনিও যে একটু ভয় না পেলেন তা নয়। তিনি কি করবেন স্থির করতে না পেরে হতভম্ব হয়ে ঐ জিনিষটার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ ঐভাবে কাটবার পর তিনি কতকটা আত্মস্থ হয়ে ভাবলেন—“ব্যাপার খানা কি! এমন ভীষণ জিনিষ

বালির ওপরে পড়ে যে একেবারেই চুপচাপ! তাহ'লে কি ওটা নাইট্রোগ্লিসিরিন নয়।" তিনি সন্ধান করে দেখলেন যে জিনিষটা নাইট্রোগ্লিসিরিনই। তখন তিনি একটু সমস্যায় পড়ে গেলেন। অতি সন্তর্পণে বালিশুদ্ধ ঐ জিনিষটা হাতে তুলে নিলেন। নিয়েই চলে এলেন পরীক্ষাগারে।

সেখানে পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পারলেন—যে এমন কোন জিনিষ যার শোষণ করবার শক্তি আছে তার সঙ্গে যদি নাইট্রোগ্লিসিরিন মিশিয়ে নেওয়া যায়, তা হ'লে এই ভীষণ জিনিষটাকে বেশ ভালরকমেই বশে আনা যেতে পারে। এবং এরই সাহায্যে এরূপ মারাত্মক বিস্ফোরক তৈরী করা যাবে যা' দিয়ে পাহাড় পর্বত অতি অনায়াসে উড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারবে। তিনি ভাবলেন, পাহাড় পর্বত উড়িয়ে দেবার মত শক্তিশালী বিস্ফোরক আবিষ্কার করতে পারলে মস্তবড় একটা কাজ হবে। এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তিনি এক নূতন কল্পনায় মেতে উঠলেন। তিনি আরও পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, বালির সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসিরিন মিশিয়ে বিস্ফোরক তৈরী করা যায় বটে; কিন্তু সকল সময় তা থেকে

দাতা নোবেল

খুব ভাল কাজ পাওয়া যায় না। যারা এ জিনিষ ব্যবহার করবে তাদের সময় সময় বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা হতে পারে। তাই তিনি আবার অন্য জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। এবারে তিনি কেইসেলগার নামক এক রকম অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট বেলে পাথর নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। এতে খুবই ভাল ফল পাওয়া গেল। এবারে জিনিষটা খুব নিরাপদও হোল। তিনি এরই নাম দিলেন ডিনামাইট। ডিনামাইটের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নোবেলের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এবং ডিনামাইট বিক্রী করে তাঁর আয়ও হতে লাগলো খুবই বেশী।

ডিনামাইট আবিষ্কার করেই যে তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন তা নয়। তিনি নাইট্রোগ্লিসিরিন নিয়ে আরো নানা রকম পরীক্ষা শুরু করলেন। গানকটন (Gun cotton) নামে একটা জিনিষ নাইট্রোগ্লিসিরিনের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি জেলিব মত এক রকম ভীষণ বিস্ফোরক তৈরী করলেন। এ জিনিষটা ডিনামাইটের চেয়ে আরও বেশী শক্তিশালী হোল। পৃথিবীতে এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী বিস্ফোরক খুবই কম আছে। তিনি এসব ছাড়া আরও বহু রকম বিস্ফোরক আবিষ্কার করেছিলেন। তার মধ্যে ধূমহীন বারুদও একটা।

দাতা নোবেল

পৃথিবীতে যুদ্ধ ত আজকাল একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাপারের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বড় হবে তাই নিয়েই ঝগড়া বাঁধবার ফলে এই সব যুদ্ধ ঘটে থাকে। এসব যুদ্ধে কত হাজার হাজার লোক নিহত হয়। এসব যুদ্ধে মানুষ মারবার যে সব ভীষণ মারাত্মক গোলাগুলী ও অস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার অনেকগুলিই নোবেলের আবিষ্কৃত।

সারাটা জীবন শুধু এই সব ভীষণ ভীষণ মানুষ মারবার কল আবিষ্কার করে শেষ জীবনে তাঁর ভারী অনুশোচনা হয়েছিল। তাই তিনি পৃথিবীতে যাতে যুদ্ধ না বাঁধতে পারে এজ্ঞা যাঁরা চেষ্টা করে পৃথিবীতে শান্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবেন, অজ্ঞা পুরস্কারের সঙ্গে তাঁদের জ্ঞাও একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।



डि. ए. स्कूल, अमृतसर

মানুষের বন্ধু

বেশি দিনের কথা নয়—মাত্র পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা।

একদিন ছয়টা ছোট ছোট ছেলে পাহাড়ের ওপরে ভেড়ার পাল চরতে দিয়ে, একটা গাছের ছায়ায় বসে খেলা করছিলো। এমনি সময় একটা কুকুর সাঁ সাঁ করে তাদের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। কুকুরটার রোগা চেহারা, আর মুখ থেকে অবিশ্রান্ত ফেনার মত লাল ঝরতে দেখেই, ছেলের দল বুঝতে পারলো যে, কুকুরটা পাগল। তখন তা'রা মনে মনে প্রমাদ গুণলো। সুতরাং সবাই চটপট উঠে দিলো ভেঁ দৌড়। ওদের ভিতর জুপিলের বয়স ছিলো একটু বেশি—সে পেছনে থেকে ওদের রক্ষা করতে করতে চললো। এদিকে পাগলা কুকুরটা ছুটে এসে জুপিলকে সামনে পেয়ে, তাকেই কামড়াতে শুরু করলো।

জুপিল ভয় পেয়ে কিন্তু কুকুরটার কাছে অমনি আত্ম-সমর্পণ করলো না। সে তার সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কুকুরটাকে কাবু করে মাটিতে ফেলে একেবারে চেপে ধরলো। এদিকে কুকুরের কামড়ে তার সর্বাস্ত্র ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, তবু তার ক্রম্বেপ নেই—সে কুকুরটাকে চেপেই ধরে আছে। এমনি সময় জুপিলের ছোট

ভাই দূর থেকে ব্যাপারটা দেখে তার ভেড়া তাড়াবার লাঠিটা নিয়ে ছুটে এসেই কুকুরটার মুখের ওপরে সপাং সপাং ঘা মারতে শুরু করলো। মার খেয়ে কুকুরটা পালিয়ে গেলো।

জুপিল তা'র সঙ্গীদের রক্ষা করবার জন্য যে সাহস দেখিয়েছিলো, তা' সত্যি সত্যিই যে বিশেষ করে প্রশংসা পাবার যোগ্য—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাক—এরপর ধরাধরি করে ত তা'কে বাড়ীতে আনা হলো। জুপিলের সারাদেহে কুকুরে কামরাবার ভীষণ ঘা গুলো দেখে তা'র বাবা আর মা ভয়ে একেবারে শিউরে উঠলেন।

‘এরপর যখন এই ঘাগুলো বিষাক্ত হয়ে জলাতঙ্ক রোগ হবে, তখন আর ওকে বাঁচানো যাবে না।’—এই চিন্তায়ই তা'রা আকুল হয়ে কান্না আরম্ভ করে দিলেন।

ক্রমে এই ব্যাপারটা গ্রামের মোড়লের কানে গেলো। তিনি এসে বল্লেন—“ভয় নেই—প্যারিসে আমার এক ডাক্তার-বন্ধু আছেন—তাঁর নাম লুই পাস্তুর। অল্পদিন হলো তিনি এই জলাতঙ্ক রোগের এক নূতন ওষুধ আবিষ্কার করেছেন।” মোড়লের কথা অবহেলা করা চলে না—সুতরাং জুপিলকে চিকিৎসার জন্য লুই পাস্তুরের কাছে প্যারিসেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মানুষের বন্ধু

এর পূর্বে পাস্তুর মাত্র এই ব্যারামের আর একটা রোগীর চিকিৎসা করে তা'কে আরোগ্য করেছিলেন। তা' হ'লেও তাঁ'র নিজের আবিষ্কৃত চিকিৎসা-প্রণালী'র ওপরে তা'র যে খুব বিশ্বাস ছিলো—তা' নয়। তাই তিনি প্রথমে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন যে, তিনি এই নূতন রোগীটির চিকিৎসার ভার গ্রহণ করবেন কি না! এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি তাঁ'র পরীক্ষাগারের এপাশে ওপাশে চিন্তিত মনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বহুক্ষণ ভেবেও তিনি কিছু স্থির করতে না পেরে তাঁ'র সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটলেন। তাঁ'দের কিন্তু পাস্তুরের নূতন আবিষ্কৃত চিকিৎসা-প্রণালী'র ওপরে অগাধ বিশ্বাস ছিলো। তাই তাঁ'রা এ বালকটির চিকিৎসার ভার গ্রহণ করবার জন্য তাঁ'কে বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁ'দের উৎসাহ পেয়ে, তিনি ওর চিকিৎসার ভার নিলেন।

এরপর জুপিলকে ইন্জেক্‌সন্ দেওয়া হলো—এক দিন, দু' দিন করে এক সপ্তাহ; দশ দিন—পনের দিন কেটে গেলো—তবু জুপিলের শরীরে জলাতঙ্ক বোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। পাস্তুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। একদিন যে, পাস্তুরের কি ভাবে দিন-রাত্রি কেটেছে—সে জানেন শুধু এক ভগবান্। দিন নেই, রাত্রি নেই—আহার নেই, নিদ্রা নেই—পাস্তুর তাঁ'র পরীক্ষাগারে বসে বসে শুধু

মানুষের বন্ধু

যন্ত্রপাতি নিয়ে এক ওষুধের সঙ্গে আর এক ওষুধ মিশিয়ে পরীক্ষা করেছেন—আর মাঝে মাঝে সেই ওষুধগুলি জুপিলের শরীরে ইন্জেক্শন্ করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কাজ করতে করতে পরীক্ষাগারের টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন—আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতেন—‘ছোট্ট একটা ছেলে, মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তাঁ’র পায়ের তলায় বসে কাঁদছে—ওঃ কী করুণ সে কান্নার সুর!’ সে সুরে এই দরদী “মানুষের বন্ধুর” ঘুম ঘুচে যেতো। তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে আবার যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা করতে বসে যেতেন। তাঁ’র মনে শুধু এই চিন্তা—“এ বালককে যেমনি করেই হোক বাঁচাতেই হবে।” বাঁচাতে তিনি পারলেনও। প্রায় মাসখানেক সময় যখন পার হয়ে গেলো—তখন সকলেই বুঝলো যে, আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

জুপিল আরোগ্য লাভ করে আবার তাঁ’র বাবা ও মায়ের কাছে ফিরে গেলো। এই যে এত বড় একজন ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক যা-ই বলি—এ’র জীবন-কথা—ইনি কি করে—কি কি সব ব্যারামের ওষুধ আবিষ্কার করে গেছেন—তা শুনতে নিশ্চয়ই তোমাদের সবারই আগ্রহ আছে।

পাস্তুরের বাবা ছিলেন, নেপোলিয়ানের সৈন্যবিভাগে সার্জেন্ট-মেজর। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে, তিনি

ফরাসী দেশের অন্তর্গত জুরা প্রদেশে বাস করতে আরম্ভ করেন। এইখানেই পাস্তুরের জন্ম হয়।

ছেলেবেলায় পড়াশুনোতে তাঁর মনোযোগ একেবারে ছিলো না বলেও চলে। সে সময় যা' কিছু তাঁর ঝাঁক ছিলো—তা' শুধুমাত্র ছবি আঁকার দিকে। ছেলের পড়াশুনোতে অমনোযোগ দেখে, তাঁর বাবা ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

তিনি মনে মনে ভাবলেন,—‘না, এমনভাবে হাল ছেড়ে দিলে ত ছেলেটা কালে একটা গণ্ডমূর্খ হবে।’ তাই তিনি জোর করে তাঁকে পড়বার জন্য “একোলে নর্ম্যাল” নামক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। দিলে কি হবে! পড়াশুনোয় তাঁর মন মাত্রই বসলো না। তিনি পালিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। কিছুদিন বাড়ী বসে আবার ছবি আঁকা চললো। এরপর আবার তাঁকে আর একটা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সেখানে ভর্তি হয়েই তাঁর উন্নতির সূচনা হলো। সেখানে ভর্তি হয়ে তাঁর বিজ্ঞানচর্চার দিকেই বিশেষ ঝাঁক গেলো। ক্রমে সম্মানের সঙ্গে তিনি সেই বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ’লেন। এরপর তিনি বিজ্ঞানচর্চার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ “একোলে নর্ম্যালএ” আবার প্রবেশ করলেন।

সেখানে বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চা করে তিনি অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করলেন। এই সময় তিনি প্রায় সকল সময়েই পরীক্ষাগারে বসে নূতন বৈজ্ঞানিক-তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন। ক্রমে তিনি এমন একটা পদার্থ আবিষ্কার করে ফেললেন যে, যার খোঁজ এর পূর্বে আর কেউ-ই পান নি। সেই আবিষ্কারে তিনি কোন একটা রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে মানুষের ধারণাই একেবারে বদলে দিলেন; পাস্তুরের যশ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো।

এরপর তিনি লীল্ কলেজে অধ্যাপকের চাকুরী গ্রহণ করেন। লীল্ শহর মদ তৈরীর জন্য বিখ্যাত। সে সময় মদওয়ালারা মদ তৈরী করে রেখে দিতো—আর অল্পদিন পরেই সেই মদ পঁচে একেবারে নষ্ট হয়ে যেতো। এই কারণে মদওয়ালাদের ভারী লোকসান হতো। এই ব্যাপারটা পাস্তুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি ভাবতে ভাবতে স্থির করলেন—শুধু মদই ত নয়, পৃথিবীর সকল রকম জিনিষই ত পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। কেন এমন হয়? তিনি পরীক্ষা করে করে ঠিক করলেন যে, এক প্রকার ছোট ছোট পোকা জিনিষের মধ্যে প্রবেশ করে, সেগুলোকে বিকৃত করে তোলে। এই জিনিষগুলোকে যদি এমনভাবে রাখা

মানুষের বন্ধু

যায়, যাতে তার মধ্যে কোন পোকা প্রবেশ করতে না পারে তা হ'লে আর সেগুলো পঁচবে না।

বোঝবার সুবিধার জন্ত, এই আবিষ্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দু'একটা আবিষ্কারের কথা এখানে বলে নিতে হবে। পূর্বে ক্ষতস্থান বা ঘা বিষাক্ত হয়ে বহু লোক মারা যেতো। ঘা বিষাক্ত হয় কি করে—তা হয়ত তোমরা সকলে জানো না। ছোট ছোট এক রকম পোকা আছে, ঐ পোকাগুলোই ঘায়ের ভেতর ঢুকে ঘা বিষাক্ত করে তোলে। তা'রা ঘায়ের মধ্যে ঢুকে সেখানে রীতিমত বাড়ীঘর তৈরী করে বাস করতে আরম্ভ করে—সেখানে ডিম পারে, তা' থেকে ছানা হয়। তা'দের বংশবৃদ্ধি এমন আশ্চর্য্য দ্রুতগতিতে হ'তে থাকে যে, শুন্লে একেবারে অবাক হ'বে। প্রত্যেক মুহূর্তে এক-একটা পোকা থেকে লক্ষ লক্ষ ছানা হয়। এই ভাবে বংশ বৃদ্ধি করে ঘায়ের মধ্যে ওরা এমন একটা কাণ্ড শুরু করে দেয় যে, অল্প সময়ের ভেতরেই ঘা-টা বিষাক্ত হয়ে, রোগীর জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়ে ওঠে।

আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে—সর্বত্রই এই পোকা কোঁচিতে কোঁচিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনে ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয়—না? কেউ কেউ হয়ত মনে মনে ভাবছো—কোঁচিতে কোঁচিতে এই পোকা সর্বত্র ঘূড়ে বেড়াচ্ছে—কই

আমরা ত একটাও দেখতে পাই না। ও পোকা এমনি ছোট যে, খালি চোখে দেখা যায় না।

তা'দের দেখতে হ'লে, একরকম কাঁচের দরকার হয়। সেই কাঁচের ভেতর দিয়ে ওগুলোকে দেখা যায়। খুব ছোট বলেই এই পোকাগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে— জীবাণু (জীব+অণু); অর্থাৎ ক্ষুদে প্রাণী। আর যে কাঁচের ভেতর দিয়ে এই পোকাগুলোকে দেখা যায় তা'কে বলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

যোশেফ্ লিষ্টার নামে একজন ডাক্তার, যা যা'তে বিষাক্ত না হতে পারে, সেই চিকিৎসা আবিষ্কার করেন। তিনিই আবিষ্কার করেন যে, কোন তেজস্কর পদার্থ ঘায়ে লাগালে, আর জীবাণু গিয়ে তা'র কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। সেই আবিষ্কারই পাল্লুরকে প্রথমে ভাবিয়ে তোলে যে, তাহলে বোধ হয় ঘা-ও যেমনি ভাবে বিষাক্ত হয় পঁচে— তেমনি ভাবে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিও পঁচে যায়।

আমাদের ভাবতেও গা শিউরে ওঠে যে, সকল সময়েই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবাণু চারদিকে ঘূরে ঘূরে আমাদের স্বাস্থ্যস্থানির চেষ্টা করছে! পাল্লুরই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, মানুষের অনেক রকম ব্যারামই এই জীবাণুরা ঘটিয়ে থাকে।

মানুষের বন্ধু

পৃথিবীর মানুষকে সেই ভীষণ জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচাবার উপায় বা'র করতে তিনি চেষ্টা আরম্ভ করলেন। কি করলে জীবাণুগুলো মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে না পারে, কি করলে অতি সহজে ওগুলোকে ধ্বংস করা যায়, এইসব তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। সকল সময়ই যদি মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে—তা' হ'লে জীবাণু সহজে আর কোন অনিষ্ট করতে পারে না। কারণ সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে জীবাণু বেশিদিন বাঁচতে পারে না। কাজেই কোন অনিষ্টও করতে পারে না। আর একটা জিনিষ পাস্তুর আবিষ্কার করেন—সে হচ্ছে যে, 'উত্তাপ জীবাণুদের সহ্য হয় না।' তীব্র গরমে সেগুলো মরে যায়।

এই সময় ফরাসী দেশে গুটীপোকার মহামারী শুরু হয়। কাজেই সে দেশের রেশমের ব্যবসায় ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হয়। পাস্তুর সেই মহামারী নিবারণ করে, রেশম ব্যবসায়ীদের ক্ষতি বন্ধ কব্বার জন্তু, গবেষণা আরম্ভ করে বুঝতে পারলেন যে, তা'-ও ঐ জীবাণুদেরই কাজ। ওই জীবাণুদের ধ্বংস করতে পারলেই মহামারী বন্ধ হবে। সুতরাং ওর ওষুধ বা'র করতে আর বেশি সময়ের প্রয়োজন হলো না।

মানুষের বন্ধু

তারপর হলো আর এক ব্যাপার। ফরাসী দেশে পশমী কাপড় বুনবার ব্যবসায় আছে। সে জগৎ এক একজন লোক বহু মেষ পুষে থাকে। ওই সময় এক রকম ব্যারাম হয়ে ঐ সব মেষ মরে যেতে লাগলো। এতে দেশের ভারী ক্ষতি হতে আরম্ভ হলো। আবার ডাক পড়লো পাস্তুরের। ঐ রোগের নাম হলো এন্থ্রাক্স। পাস্তুর এন্থ্রাক্স রোগে আক্রান্ত ভেড়ার দেহ থেকে জীবাণু সংগ্রহ করে তাই দিয়ে এক রকম ওষুধ তৈরী করলেন। যে সমস্ত ভেড়া ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা, তা'দের দেহে ঐ ওষুধ তিনি প্রয়োগ করতে লাগলেন। তা'তে খুব ভাল ফল হলো। সহজে আর কোন ভেড়া ঐ রোগে আক্রান্ত হলো না।

তারপর তাঁ'র একটা মেয়ে টাইফয়েড্ রোগে মারা যায়। এই মৃত্যুর দৃশ্য তাঁ'র মনের ওপর এমন একটা ছাপ রেখে গেলো যে, সেই থেকে তিনি তাঁ'র জীবন—শুধু ছোঁয়াচে রোগের ওষুধ আবিষ্কারের কাজেই সমর্পণ করলেন। ক্রমে তিনি কয়েক রকম ছোঁয়াচে ব্যারামের ওষুধ বা'র করেন। ইরিসিপ্লাস্, নালী ঘা, রক্ত-বিষাক্ত প্রভৃতি ব্যারামে পূর্বে যে, কত শত-সহস্র লোক মারা যেতো তার ইয়ত্তা ছিলো না। পাস্তুরের আবিষ্কারের ফলেই

মানুষের বন্ধু

আজকাল এ সব ভীষণ ব্যাধিতে কোন লোক আর বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না।

তারপর তাঁর বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কার জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা। এই চিকিৎসা আবিষ্কারের জন্মই পাস্তুরের নাম মানুষ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। বাল্যকালে পাস্তুর একটি ছোট ছেলেকে পাগলা শেয়ালে কামড়াতে দেখেছিলেন। সেই থেকেই ঐ ব্যাপারটা তাঁর মনে মুদ্রিত হয়ে ছিলো। সেই ছেলেটির পরে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু হয়। জীবাণু নিয়ে নাড়াচাড়া করবার ফলে পাস্তুর বুঝতে পারলেন যে, পাগলা কুকুর বা শেয়াল প্রভৃতি প্রাণীর মুখ থেকে যে ফেনা বস্তু থাকে, তারই সঙ্গে এমন একটা বিষ আছে যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ঐ রোগের সৃষ্টি করে থাকে। তখন তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। এ ব্যাপারের পরীক্ষার জন্ম একটা পাগলা কুকুর প্রয়োজন হলো। পাগলা কুকুর কেউ এনে দিতে স্বীকার করলো না। তখন পাস্তুর নিজেই পাগলা কুকুর সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন এবং অল্পদিনের ভেতরেই একটা সংগ্রহ করতেও সমর্থ হ'লেন। তারপর সেটাকে নিয়ে তাঁর পরীক্ষা চললো। তিনি তন্ন তন্ন করে তা'র সব আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে যেতে লাগলেন। কুকুরটা শেকল দিয়ে

মানুষের বন্ধু

দূরে বাঁধা থাকতো, তিনি দিন-রাত বসে বসে শুধু লক্ষ্য করতেন, সেটা কি করে না করে, কি কি লক্ষণ তাঁর দেহে প্রকাশ পায় ইত্যাদি। পরে ঐ কুকুরটাকে মেরে তাঁর মস্তিষ্ক তিনি একটা সুস্থ কুকুরের শরীরে ইন্জেক্ট করে ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে এই হলো যে, পাগলা কুকুরে কামড়ান সত্ত্বেও ওর শরীরে কোন ব্যারামের লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। তখনই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই ওষুধেই ঐ ব্যারাম মেরে যেতে পারে। এমন সময় একটা বালক পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য আসে। ঐ প্রণালীতে চিকিৎসা করে তিনি তাঁকেও আরোগ্য করেন। এই বালকটির নাম জোসেফ মাইষ্টার—বাড়ী আল্‌সাস প্রদেশে। এর পরের একটা ঘটনা পূর্বেই বলেছি।

এই সমস্ত আবিষ্কার করার পাস্তুর পৃথিবীর যে কত উপকার করে গেছেন তা' আর কি বলব? পাস্তুর যে সমস্ত ব্যাধির চিকিৎসা আবিষ্কার করেছেন—পূর্বে যে কত লোক ঐ সব ব্যারামে মারা যেতো, তা' বলে শেষ করা যায় না। যাঁরা এই সব আবিষ্কারের জন্য জীবনব্যাপী পরিশ্রম করেন—তাঁরা কি সত্যি সত্যিই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ন'ন?

আলোর ভেঙ্কী

ব্যারিষ্টার রজত বোসের ছেলে পীণ্টু বোসকে তোমরা অনেকটাই হযত চেনো। অমম ডান্‌পিটে আর ছুঁচী হয় না—একেবারে তোমরা যাকে বল Number One অর্থাৎ এক নম্বর। এই পীণ্টু বোসেরই একটা কাহিনী আজকে তোমাদের বলবো।

এন্থায়েল পরীক্ষা ও ক্লাস প্রমোশন দুই-ই শেষ হ'য়ে স্কুল বড়দিনের ছুটি হ'য়ে গেছে। বাসু আর কি—একেবারে অফুরন্ত অবসর। উত্তুরে হাওয়া বেশ জোরে বইতে শুরু করেছে—সুতরাং ঘুড়ি ওড়াবার এমন লোভনীয় সময় আর পাওয়া যাবে না। ছুপরে বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে গেলে, পীণ্টু চুপি চুপি তার ঘুড়ি আর নাটাই নিয়ে একেবারে উঠলো গিয়ে তেতলার ছাদে। উত্তুরে হাওয়ায় ঘুড়ি ছাড়তেই সাঁ সাঁ করে সেখানা উঠে গেলো আকাশে। পীণ্টুর ঘুড়িখানাকে অমন সহজভাবে উড়তে দেখে বিপরীত দিকের একটা ছাদ থেকে ঘোষেদের কানাই পীণ্টুর ঘুড়িখানাকে কেটে দেওয়ার জন্য যেন একেবারে মরীয়া হ'য়ে উঠে, নাটাই থেকে সূতো ছাড়তে লাগলো। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য পীণ্টু মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। এমনিভাবে হঠাৎ ঘুড়িখানাকে কেটে ফেললে মস্ত বড় অপমান! সুতরাং

বিজ্ঞানের গল্প

৬৫

আলোর ভেঙ্কী

সে আর কোন দিকে না তাকিয়ে, তার ঘুড়িখানাকে যেন না কেটে দিতে পারে, এজন্য সেটাকে সরিয়ে নেবার জন্য, সূতো টানতে টানতে ছুটে ছাদের অপর কোণের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগলো। ছাদের সেদিককার প্যারাপেট্টা যে ছোট ছিলো সে-কথা তার একেবারেই খেয়াল ছিলো না— এন্নি মত্ত সে হ'য়ে পড়েছিলো। ঐদিকে ছুটে যেতেই— ব্যস্ আর কি—প্যারাপেটের গায়ে হোঁচট খেয়ে পীণ্টুরাম একেবারে “পপাত ধরনীতলে”।

পীণ্টুর মত জোয়ান ছেলে ব'লেই রক্ষা—অপর কেউ হ'লে হয়ত একেবারে ফুটবলের মত গোলাকার হ'য়ে যেতো। মাটিতে প'ড়েই ত পীণ্টু ভীষণ চীৎকার! তার চীৎকার শুনে সবাই সেখানে ছুটে এলো। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে কেউ বললে হাত, কেউ বললে পা, আবার কেউ বললে যে— তেতলার ছাদ থেকে যখন পড়েছে তখন ও দু'টোই না ভেঙ্গে যায় না। পীণ্টুর মামা কেঁপেবাবু বিবেচক লোক, তিনি বললেন—“হাতই ভাজুক আর পা-ই ভাজুক বা আর কিছুই হ'য়ে থাক—সে নিয়ে গবেষণা ক'রে কোন লাভ নেই। কাছেই ত হাসপাতাল রয়েছে—সেখানে নিয়ে গেলেই ব্যাপার সব বোঝা যাবে।” ঘরের মোটরে তাকে নিয়ে কেঁপেবাবু হাসপাতালে ছুটলেন।

আলোর ভেঙী

হাসপাতালের ডাক্তার ভাল ক'রে হাত পা টিপে টিপে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন—“এক্স-রে (X-Ray) দিয়ে পরীক্ষা না করলে সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না কি হয়েছে।” ডাক্তার X-Ray পরীক্ষার ঘরে পীণ্টুকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে বললেন—“ভয়ের কোন কারণ নেই, পায়ের একখানা ছোট হাড় মাত্র স'রে গেছে—সেটা ঠিকভাবে বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিচ্ছি—এতেই সেরে যাবে। তবে বিছানায় কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হবে।” এ যাত্রায় ডানপিটে পীণ্টু অল্পেতেই রক্ষা পেয়ে গেলো।

ঘটনাটা শুনে তোমরা হয়ত অবাক হ'য়ে ভাবছ—এ কি ক'রে সম্ভব হলো—একটা যন্ত্রের সাহায্যে—পায়ের ভেতরের হাড় যে ভেঙ্গে গেছে তা চামড়া মাংস ইত্যাদি না কেটেও ডাক্তার কি করে বুঝতে পারলেন! সত্যি এতে অবাক হবার মত অনেক কিছুই আছে। X-Ray যন্ত্রটা ভারী আশ্চর্য্য জিনিস! এই যন্ত্রের ভেতর থেকে এমনি তীব্র একরকম আলো বের হয় যে, সেই আলো হাড় এবং লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ ছাড়া—আর যে কোন প্রকার অস্বচ্ছ পদার্থই ভেদ ক'রে যেতে পারে।

এই এক্স-রে যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম আচার্য্য উইলিয়ম কোনরেড্ ফন্ রন্ডেন্। আবিষ্কার্তার নাম

আলোর ভেদী

অনুসারে 'এই আলোকে রন্‌জেন্‌ আলোও বলা হয়।
জার্মানীর অন্তর্গত প্রাশিয়া প্রদেশের লেনেপ শহরে ১৮৪৫
খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়।

রন্‌জেন্‌ আলো বা এক্স-রে নামটী তোমাদের অনেকেরই
হয় ত অজানা নয়। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত
রন্‌জেন্‌ আলো দেখেও থাকবে। আজকাল অনেক সহরের
হাসপাতালেই এ যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
মানুষের শরীরের চামড়া বা তার নীচে যে মাংস আছে
সবইত অস্বচ্ছ পদার্থ; কাজে কাজেই মানুষের দৃষ্টি এগুলো
ভেদ ক'রে যেতে পারে না, সুতরাং মানুষের শরীরের ভেতরের
কোন যন্ত্র যদি রোগাক্রান্ত হ'য়ে বিকল হ'য়ে পড়ে—তখনই
হয় সব চেয়ে মুশ্কিল। সেই সময়েই এই যন্ত্রটির সাহায্য না
হ'লে আর চলে না। কাজেই রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে
এই যন্ত্রটির প্রয়োজন খুবই বেশী। এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার
পূর্বে শরীরের চামড়া, মাংস ইত্যাদি কেটে নিয়ে অথবা
অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে চিকিৎসকদের কাজ সারতে
হতো—এখন আর তা হয় না। এই আলোর সাহায্যেই
পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পারা যায় ভেতরে কি হয়েছে।

রন্‌জেন্‌ আলোর সম্বন্ধে জানবার সঙ্গে সঙ্গে তার
আবিষ্কার জীবন-কথাও কিছু কিছু তোমাদের জেনে

নিতে হ'বে। তাঁর দেশ জার্মানীতে হ'লেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন হল্যাণ্ডে। হল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ ক'রে, তিনি উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য সুইজারল্যান্ডের জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিজ্ঞানের সর্বশেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে, তিনি সেখান থেকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি লাভ করেন। এর পর তিনি জার্মানীর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপকের কাজ করেন। কয়েক বৎসর এইভাবে সহকারী অধ্যাপকের কাজ ক'রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার পর, তিনি উরজ্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকের পদ পেলেন। সেইখানেই রন্জেনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হলো।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারটি ছিলো যেমনি বড় তেমনি সেখানে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও ছিল প্রচুর। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান ক'রেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলেন। বাল্যকাল থেকেই রন্জেন খুব ভালো ফটোগ্রাফ তুলতে পারতেন। ফুঁকো কাঁচের নল, বোতল ইত্যাদি তৈরী করবার অভিজ্ঞতাও তিনি অল্প বয়সেই লাভ করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খুব বেশী কাজে এসেছিলো। এ অভিজ্ঞতা বাল্যে সঞ্চয় না করলে হয়ত

আলোর ভেক্টর

পুরবর্তী জীবনে রন্জেন্ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলে পরিচিত হ'তে পারতেন না। তা' হ'লে হয়ত শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পড়িয়েই তাঁর অশ্রান্ত সাধারণ অধ্যাপকের মত জীবন অতিবাহিত করতে হতো।

রন্জেনের আবিষ্কার সম্বন্ধে ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে গোড়ার কথা কিছু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যুৎ কা'কে বলে তা হয়ত তোমরা অনেকেই জানো। বিদ্যুৎ জিনিষটা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ভেতর বহুকাল ধ'রেই নানারকম গবেষণা চলছিলো। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বললেন যে—বিদ্যুতের গতি বাতাসে বাধা পায়। কথাটা সত্য কিনা, পরীক্ষা করবার জন্য গ্লুকার নামে একজন বৈজ্ঞানিক একটা কাচের পাত্রে কোশলে বায়ুহীন অর্থাৎ তার ভেতর থেকে সমস্ত বাতাস বার ক'রে নিয়ে—সেই শূন্য পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ফলে ব্যাপার দাঁড়াল ভারী অদ্ভুত। দেখা গেলো যে, পাত্রের এক মুখ থেকে এক প্রকার অদ্ভুত তেজসম্পন্ন সবুজ, নীল, হলুদে প্রভৃতি নানাবর্ণের আলো বা'র হ'য়ে পাত্রের অপর মুখে গিয়ে পড়ছে। বায়ুহীন কাচ-পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালাবার ফলে যে নূতন একটা আশ্চর্য আলোর সৃষ্টি হলো সেটা কি সত্যি সত্যিই আলো না অপর কিছু! সত্যিই

ਮੇਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ



ਮੇਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ



এটা আলো নয়—এ এক প্রকার রশ্মি। এ নূতন আবিষ্কৃত রশ্মির নাম দেওয়া হলো ক্যাথোড্ রশ্মি। স্মার উইলিয়ম ক্রুক্শ্ নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বল্লেন—এই যে ক্যাথোড্ রশ্মি—এ আর কিছুই নয়—বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে এর সৃষ্টি এবং এ রশ্মিও বিদ্যুতেরই অণু পরমাণু।

স্মার উইলিয়ম ক্রুক্শ্ তাঁর এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠ ক'রে বৈজ্ঞানিক মহলে খুব সাড়া প'ড়ে গেলো। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন।

উইলিয়ম ক্রুক্শ্‌সের প্রবন্ধ পাঠ ক'রে রন্ডেনের মনেও ভারী একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হলো। তিনিও এ বিষয়ে গবেষণা করতে মনস্থ করলেন। তাঁর গবেষণাগারের নিভৃত কোণে বসে যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ফুঁকো কাচের পাত্র তৈরীর অভিজ্ঞতা তাঁর এ সময় ভারী কাজে এলো। পরীক্ষার জন্য বায়ুশূণ্য কাচের পাত্র তিনি নিজেই তৈরী করতে সমর্থ হ'লেন। দিনের পর দিন তিনি পরীক্ষা ক'রে কাটিয়ে দিতে লাগলেন।

একদা রন্ডেন্ তাঁর গবেষণাগারের নিভৃত কোণে ব'সে একটা বায়ুশূণ্য কাচের নলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে পরীক্ষা করছেন। কাচের নলটা একটা কার্ডবোর্ডের

আলোর ভেক্টর

বাক্সের মধ্যে বন্ধ ছিলো। সেখানে টেবিলের ওপরে বেরিয়াম প্লেটিনোসায়োনেড্-মাখানো একটা প্লেট পড়েছিলো। বেরিয়াম প্লেটিনোসায়োনেড্ জিনিষটা ভারী আশ্চর্য্য রকমের। কোন তেজের সাম্নে খানিকক্ষণ এ জিনিষটাকে রাখলে পর, সে ঐ তেজ নিজের ভেতরে গ্রহণ করে নেয়, এবং নিজেই আলো দিতে আরম্ভ করে। বিছাৎ যখন বায়ুশূন্য কাচের পাত্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল—তখন রন্ডেজেন্ হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, বেরিয়াম প্লেটিনোসায়োনেড্-মাখানো প্লেটটার ওপরে সবুজ আলোর একটা ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। প্রথম তিনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, হয়ত বা কার্ডবোর্ডের বাক্সটার কোথাও ছিদ্র আছে—সেই ছিদ্রপথে আলোক বেরিয়ে আসছে, আর বেরিয়াম প্লেটিনোসায়োনেড্ সেই তেজ গ্রহণ করে আলো দিচ্ছে। তিন কার্ডবোর্ডের বাক্সটার চারদিকে অনুসন্ধান করে দেখলেন কোথাও ছিদ্র নেই। অবাক হ'য়ে তিনি ভাবলেন ব্যাপার ত তা হ'লে অণু রকম। নূতন একটা আবিষ্কারের আশায় তিনি উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন।

রন্ডেজেন্ প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী যদি না হতেন তা' হ'লে এই সবুজ ক্ষীণ আলোর রেখা সম্বন্ধে তাঁর কোন কিছুই

আলোর ভেক্টর

মনে হতো না। এইভাবেই একদা হঠাৎ “রন্জেন্ আলো” আবিষ্কারের সূচনা হয়। এই ঘটনা ঘটে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর।

রন্জেন্ একটা নূতন আবিষ্কারের সন্ধান পেলেন বটে, কিন্তু তিনি একথা কারও কাছে প্রকাশ না করে, এ নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করলেন। পূর্বে তিনি আর যে সব গবেষণা শুরু করেছিলেন, সে সমস্তই ছেড়ে দিয়ে, শুধু আলোর এই রহস্যপূর্ণ নূতন রূপের সন্ধান নিতে ব্যস্ত হ’য়ে পড়লেন। তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষা ক’রে বুঝতে পারলেন—এ নূতন আলোর শক্তি অতি অদ্ভুত। এ আলো শুধু পাতলা কার্ডবোর্ডই ভেদ ক’রে যায় না—কাঠ, কাপড় এমন কি দু’হাজার পৃষ্ঠার একখানা মোটা বই পর্যন্ত ভেদ করে চলে যায়। একদিন কি মনে করে তিনি একটা বায়ুশূণ্য কাচ-পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিয়ে, অল্প একটু দূরে প্লেটিনোসায়োনেড-মাখানো একটা প্লেট ধরলেন ; তারপর দু’য়ের মাঝখানে রাখলেন তাঁর হাতের পাতাটা। এরপর যে ব্যাপার তিনি দেখতে পেলেন তাতে আনন্দে তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর হাতের পাতার সবগুলো হাড়ই ওই প্লেটটার ওপরে খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হ’য়েছে। ঐ দিন বিজ্ঞানের

আলোর ভেকী

ইতিহাসে একটা শুভদিন। ঐ দিন বিজ্ঞান-জগতে একটা বিরাট নূতন আবিষ্কারের সূচনা হলো।

আরও মাস কয়েক গবেষণা করবার পর রন্ডেইন্ এ সম্বন্ধে আরও একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করতে সমর্থ হ'লেন। বিজ্ঞান-জগতে সে আবিষ্কারের স্থানও বহু উচ্চে। তাঁর গবেষণাগারের টেবিলের ওপর একখানা বই প'ড়েছিলো। সেই বইখানার নীচে ছিলো ফটোগ্রাফ তুলবার একটা প্লেট। রন্ডেইন্‌এর একটা অভ্যাস ছিলো, বইয়ের যে অংশটুকু পড়া হ'য়ে গেছে সেটুকু চিহ্নিত ক'রে রাখবার জন্তু বইয়ের মধ্যে একটা চাবী রেখে দেওয়া। তাঁর অভ্যাসমত ঐ বইখানার ভেতরেও তিনি একটা চাবী রেখেছিলেন। যখন তিনি এই নূতন আলো নিয়ে পরীক্ষায় ব্যস্ত, তখনও চাবীশুদ্ধ ঐ বইখানা ফটোগ্রাফের প্লেটটার ওপরেই ছিলো। রন্ডেইন্‌এর ঐদিকে আর কোন লক্ষ্যই ছিলো না। একদিন ফটো তোলবার জন্তু তিনি বইয়ের নীচ থেকে প্লেটখানা বা'র ক'রে নিয়ে ফটো তুললেন। ফটোটা কাগজে মুদ্রিত করবার পর দেখা গেল যে, ছবির ওপরে একটা কালো অস্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে ব্যাপারটা তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না,—তারপর কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা ক'রে ব্যাপারটা অনেকটা বুঝে নিলেন। ঐ ব্যাপার

বুঝতে পেরে তিনি ভারী আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে তিনি বুঝেছিলেন। ফটোগ্রাফের ওপরকার এই অস্পষ্ট কালো দাগ একটা চাবীর ফটো ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন ব্যাপারটা তাঁর কাছে একেবারে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। এই ভাবেই হঠাৎ পৃথিবীর অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূচনা হয়েছে।

তিনি আবার এবিষয়ে পরীক্ষা করবার জন্য মোটা বইটার মাঝে একটা চাবী রাখলেন এবং তার নীচে একটা ফটোগ্রাফের প্লেট রেখে, বায়ুশূন্য কাচ-পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলেন। ঠিক পূর্বের মতই হ'ল—চাবীর ফটো প্লেটটার ওপরে উঠে গেলো।

এই পরীক্ষার পর তিনি তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব বিশেষভাবে বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, যে আলো তিনি আবিষ্কার করেছেন সে অতি অদ্ভুত। সাধারণ প্রদীপ, গ্যাস বা বিদ্যুতের আলোর মত এ আলো মানুষের চোখে দেখতে পায় না। কেবল মাত্র বেরিয়াম প্লেটিনোসায়োনেড্ মাখানো কোন প্লেটের ওপরে এর শক্তি যখন প্রতিফলিত হয় তখনই একে দেখা যায়। এ আলোর এমনি শক্তি যে, অস্বচ্ছ পদার্থ পর্য্যন্ত ভেদ ক'রে চ'লে যেতে পারে—কোন বাধাই মানে না। শুধু হাড় এবং

আলোর ভেঙ্কী

লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থে এ আলো বাধা পায়। অস্বচ্ছ পদার্থের অভ্যন্তরে যে সব জিনিস আছে তার ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত ইচ্ছা করলে এ আলোর সাহায্যে তুলে নেওয়া যায়।

রন্ডেন্ এই অভাবনীয় আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের গবেষণার একটা নূতন পথ খুলে দিলেন। চিকিৎসকদের কাছেই এই আশ্চর্য্য আবিষ্কার সব চেয়ে বেশী লাভের হলো। এরপর আরও দু'বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম করে রন্ডেন্ তাঁর এই আবিষ্কারকে নিখুঁত অবস্থায় আনলেন। তিনি তাঁর এই নব আবিষ্কৃত আলোকের নাম দিলেন “এক্স-রে” (X-Ray)। বিজ্ঞানের ভাষায় এক্স (X)-এর অর্থ অনির্দিষ্ট। আবিষ্কৃত আলোর স্বরূপ পূরোপুরি-ভাবে ঠিক করতে না পেরে তিনি এর একরূপ নামকরণ করলেন। রন্ডেনের এই আবিষ্কারের কথা যখন প্রকাশ হলো তখন সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো !

রন্ডেন্ এই আলো আবিষ্কার করে চিকিৎসা জগতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রেছেন তা সত্যি সত্যিই অতুলনীয়। এই আলো আবিষ্কারের পূর্বে মানুষের শরীরের ভেতরের কোন যন্ত্র যদি বিকল হ'য়ে যেতো, তবে তার চিকিৎসার জন্তু চিকিৎসকদের অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হতো। অনেক

আলোর ভেক্টর

সময় শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রেই চিকিৎসা করতে হতো। ধর, কারও বুকের পাঁজরের একখানা হাড় ভেঙে গেলো ; সে হাড়টা কতটুকু ভেঙেছে, কি অবস্থায় কি রকম ভাবে আছে তা বাইরে থেকে বোঝবার একেবারেই উপায় নেই। কিন্তু রন্‌জেনের আবিষ্কৃত আলোর সাহায্যে তা বোঝা সম্ভবপর। ইচ্ছা করলে ঐ ভাঙ্গা হাড়ের একখানা ফটোগ্রাফ পর্যন্ত তুলে নেওয়া যায়। শুধু হাড় ভাঙ্গাই নয়, আরও অনেক কঠিন কঠিন ব্যাধির চিকিৎসায়ও এই রন্‌জেনের আবিষ্কৃত রশ্মির সাহায্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। যক্ষ্মা রোগে ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হয়ে, সেখানে ঘা হয়। যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার সময় ডাক্তারদের ফুস্‌ফুসের ঐ ঘাগুলো পরীক্ষা করবার প্রয়োজন হয় ; কিন্তু বাইরে থেকে তা করা সম্ভবপর নয়। তাই বাধা হয়ে বন্‌জেন-রশ্মির সাহায্যে ফুস্‌ফুসের একটা ফটোগ্রাফ তুলে নিয়ে তারা কাজ চালিয়ে থাকেন। পাকস্থলী, লিভার প্রভৃতি দেহের অভ্যন্তরস্থ অগ্ন্যাণ্ড যন্ত্র যদি বিকল হয়ে পড়ে তা' হ'লে চিকিৎসার জন্য তারও ফটো নেওয়া অনেক সময় দরকার হয়। রন্‌জেন রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে আজকাল বাইরে থেকেই ফটো তুলে সব ব্যাপার স্পষ্টভাবে দেখে নিয়ে, ভাল ক'রে বুঝে, সেই অনুযায়ী

আলোর ভেঙ্কী

ঐসব রোগের চিকিৎসা ক'রে, রোগীকে নিরাময় করতে চিকিৎসকদের আর তেমন কিছু অশুবিধা হয় না।

ঐই আশ্চর্য্য আবিষ্কারের জন্ম ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রনজেনের ঐই আবিষ্কার হ'য়েছিল ব'লেই পীণ্টু বোসের চিকিৎসাও ঐত সহজ হ'য়েছিল।

আলোক চিকিৎসা .

যাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে, শুধু মাত্র আলোর সাহায্যে কোন শক্ত ব্যাধি সারিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-বিদ্যার অধ্যাপক নিয়েল ফিন্সেনই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, যে, শুধু আলোর সাহায্যে নানাপ্রকার মারাত্মক ব্যাধি আরোগ্য করা যেতে পারে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ফেরো দ্বীপে এই অধ্যাপকের জন্ম হয়। কোপেনহেগেন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে সেখানেই তিনি অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

তিনি বাল্যকালে, আইসল্যান্ডের রিক্জাভিকে বাস করতেন। সেখানে বৎসরের খুব অল্প সময়ই সূর্যের আলোক পাওয়া যায়। তথায় থাকবার সময়ই আলোক ও অন্ধকারের বৈষম্য তিনি বুঝতে পারেন। তারই ফলে, আলোক সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানবার জন্ম তাঁর মন কোঁতুহলী হ'য়ে ওঠে। ওখান থেকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্ম তিনি যখন কোপেনহেগেনে এলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, আলো সকল সময়ই মানুষের দেহের শুধু উপকারই করে না—

আলোক চিকিৎসা

অপকারও ক'রে থাকে । বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হ'লে, তিনি ঐ বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে আরম্ভ করলেন ।

এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হ'লে, আলোক জিনিসটা কি, তা' খুবই ভাল ক'রে জেনে নিতে হবে । আলোক দেখে আমরা মনে করি যে, আলোকের বর্ণ খুব উজ্জ্বল সাদা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আলোকের রং সাদা নয় ; ওতে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ আছে । রশ্মিগুলো সাধারণতঃ খালি চোখে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখা যায় না । ত্রি-কোণ বিশিষ্ট কাচের টুকরা (Prism) সূর্যের আলোকে ধরলে, দেখতে পাওয়া যায়—সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে আলোক বিভক্ত হ'য়ে গেছে । সেই সাতটি রশ্মির রং মূল রং । রামধনুর গায়েও সেই সাতটি মূল রংই দেখা যায় ।

সূর্যের আলোকে যে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মি আছে তা নিউটন আবিষ্কার করেন । একথা পূর্বে নিউটনের গল্পে তোমাদের বলেছি । ঐ সমস্ত রশ্মির মধ্যে নীল, বেগুনে প্রভৃতি রশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়ার শক্তি আছে । ঐ সমস্ত রশ্মি, দেহে নানাপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে । আলোকের মধ্যে যে রশ্মি রয়েছে, সেগুলো শরীরের ওপর প'ড়ে শরীরকে আঘাত করে, আর তারই ফলে শরীরের উপকার বা অপকার হয় ।



श्री १०११ श्री १०११ श्री १०११

আলোক চিকিৎসা

বৈজ্ঞানিকেরা আলোর সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন—সূর্যের আলোতে শুধু সাতটি বর্ণের রশ্মিই নেই, তা' ছাড়া আরও অনেক রশ্মি আছে। সেগুলো চোখে দেখা যায় না। তাঁরা বলেন—আমাদের এই যে পৃথিবী, এর সমস্তটাই 'ইথার' নামে একপ্রকার জিনিষ দিয়ে পরিপূর্ণ। এর কোথাও ফাঁকা নেই। তোমরা একটা মাঠের মধ্যে দাড়িয়ে হয়ত মনে করছো—ওটা ফাঁকা; উর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকিয়ে হয়ত ভাবছো—সবটাই শূন্য; কিন্তু তা নয়—সর্বত্রই ঐ ইথার রয়েছে। খেলবার সময় পুকুরের জলে কখনও যদি টিল ছুঁড়ে থাক, তবে নিশ্চয়ই দেখেছ টিল ছুঁড়বামাত্রই সেখানে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে। আলোক জিনিসটীও ইথারের ঐ প্রকার ঢেউ। ইথারের মধ্যে যদি কোন রকমে ঢেউ তোলা যায়, তবেই আলোকের জন্ম হয়। ইথারের ছোট বড় নানাপ্রকার ঢেউয়ে নানা কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। আলো, তাপ, এক্স-রে অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-রশ্মি প্রভৃতি সমস্তই ইথারের ঢেউ থেকে জন্মে থাকে। ইথারের খুব ছোট ছোট ঢেউ থেকে জন্মে এক্স-রে। তা'র সাহায্যে আজকাল ডাক্তারেরা শরীরের মধ্যে কোথায় কোন যন্ত্র বিকল হয়েছে, তা জেনে নিচ্ছেন। তার চেয়ে যেগুলো

বড় ঢেউ সেগুলো থেকে জন্মে অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-রশ্মি (Ultra-Violet Ray)। সেই অদৃশ্য-আলোক চোখে দেখা যায় না। 'শুধু ফটোগ্রাফের প্লেটের ওপর পড়লে তা'র অস্তিত্ব ধরা পড়ে। যে ঢেউ থেকে অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-আলোক জন্মে—তার চেয়ে যেগুলো বড় ঢেউ সেগুলো থেকে বেগুনে, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মির সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-রশ্মি মানুষের শরীরে সব চেয়ে বেশী রাসায়নিক পরিবর্তন আনতে পারে। শরীরের পুষ্টির পক্ষেও ঐ রশ্মি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।

সূর্য্য-কিরণে বিভিন্ন রশ্মি আছে সত্য, কিন্তু সকল সময়ে চিকিৎসার কাজে তা ব্যবহার করা অতি শক্ত। ধর, একদিন সমস্ত আকাশটা মেঘেই ঢেকে রইলো—তখন উপায় কি? পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে বছরের অনেক সময়ই সূর্য্য-কিরণ পাওয়া যায় না; সে দেশেই বা কি হবে? তা ছাড়া সূর্য্যের আলোকে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সেখান থেকে এ রশ্মি সংগ্রহ করে, সহজে রোগীর ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। আর সূর্য্যের আলোকে যে রশ্মি পাওয়া যায় তা থেকে কৃত্রিম রশ্মির রোগ উপশম করবার শক্তিও বেশী। এই সব কথা ভেবেই

আলোক চিকিৎসা

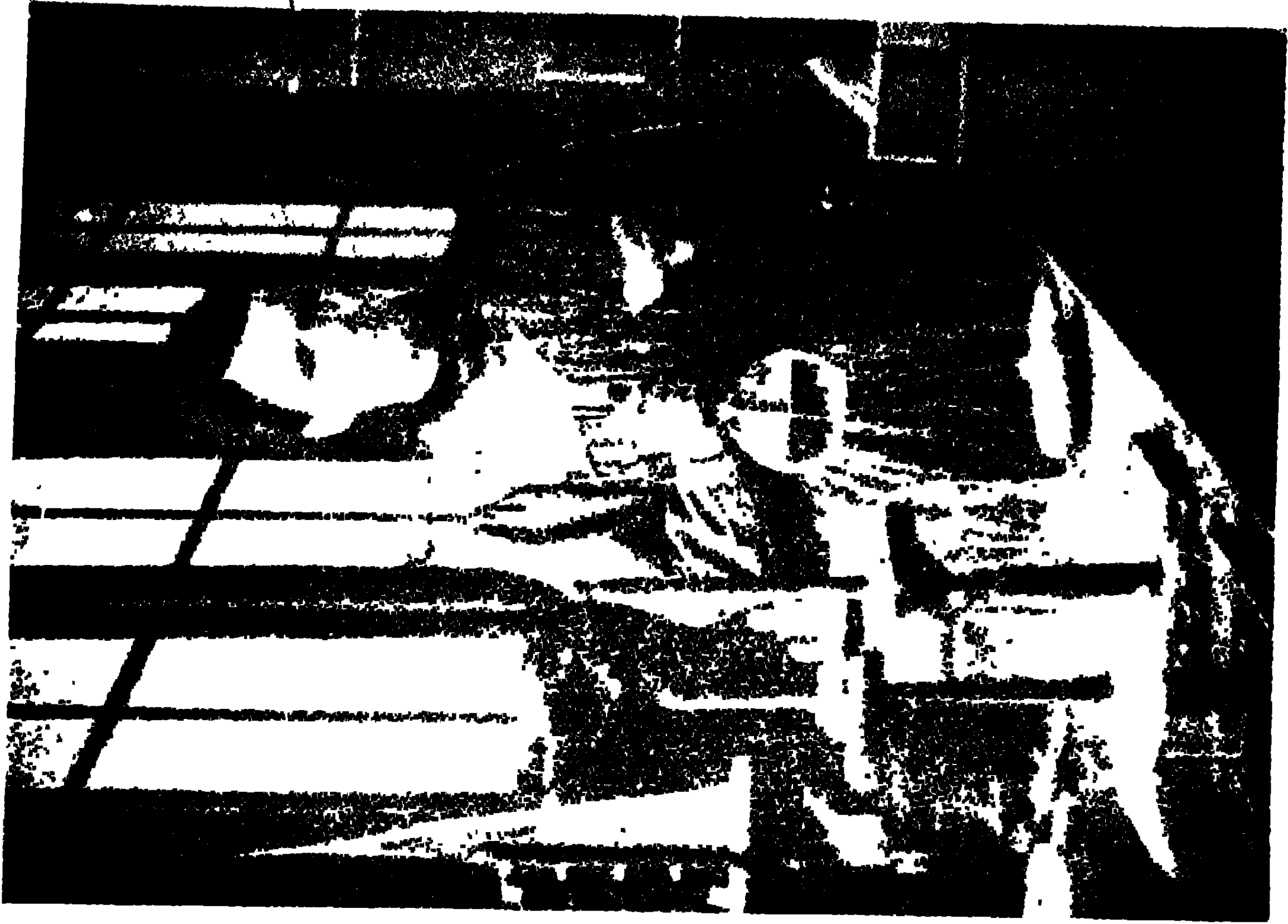
ফিন্সেন সূর্যের কৃত্রিম কিরণ ও তা'র বিভিন্ন রশ্মি আবিষ্কারের চেষ্টায় মন দিলেন।

‘আশ্চর্য্য আলো’র গল্পে তোমাদের কাছে ক্রুকশের আবিষ্কৃত অদৃশ্য রশ্মির কথা বলেছি। ক্রুকশের আবিষ্কৃত অদৃশ্য রশ্মির সূত্র অবলম্বন করেই ফিন্সেন পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি কৃত্রিম রশ্মি প্রস্তুত করতেও সমর্থ হ’লেন। সেই রশ্মি আর সূর্যালোকের অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-রশ্মি এক। এর ক্ষমতা অতি অদ্ভুত এবং বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন। অতি কঠিন ব্যাধির জীবাণুও ঐ রশ্মি অতি সহজেই ধ্বংস করতে পারে।

ফিন্সেন যখন এই গবেষণার কাজে ব্যস্ত, তখন কোপেনহেগেনে ভয়ানক বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়। ফিন্সেন শুন্তে পান যে, আমেরিকার কোন এক হাসপাতালে বিশেষ কারণে বাধ্য হ’য়ে কয়েকজন বসন্ত-রোগীকে অন্ধকারময় এক গৃহে বন্ধ ক’রে রাখা হয়েছিলো, তারা সবাই আরোগ্য লাভ করেছে এবং তাদের কারও শরীরে কোন চিহ্ন পর্য্যাপ্ত নেই। ফিন্সেন বুঝতে পারলেন যে, অন্ধকারময় গৃহে থাকার ফলে সূর্যের আলোকে যে নীল বর্ণের রশ্মি আছে তা রোগীদের স্পর্শ করতে পারে নি, তাই তা’রা রক্ষা পেয়ে গেছে।

আলোক চিকিৎসা

পুরোগো চিকিৎসা-গ্রন্থ পাঠ ক'রে ফিন্সেন জান্তে পারেন যে, পুরাকালে চীনদেশে বসন্ত-রোগীদের যে ঘরে রাখা হতো সেই ঘরের দরজা জানালায় লাল পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হতো, মধ্যযুগে ইউরোপে বসন্ত-রোগীদের সমস্ত শরীর লাল কাপড়ে মুড়ে দেওয়া হতো, ফলে তা'রা আরোগ্য লাভ কর্তো। ফিন্সেন এই ব্যাপার-গুলোকে প্রথম কুসংস্কার ব'লে ভেবেছিলেন। পরে চিন্তা ক'রে স্থির করলেন—মন্দ কি পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্ না। তিনি কয়েকজন বসন্ত-রোগীকে নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। রোগীদের ঘরের দরজা জানালায় ভারী ভারী লাল রংয়ের ফ্রানেলের পর্দা এমনভাবে টাঙিয়ে দেওয়া হলো যেন—তা'র ভেতর দিয়ে ছাড়া সূর্যালোক কোন ক্রমেই ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। তার ফল খুবই ভাল হলো। সমস্ত রোগীই সেরে উঠলো। এমন কি তাদের শরীরে বসন্তের দাগ পর্যন্ত আর রইলো না। পরীক্ষায় কৃতকার্য হ'য়ে তিনি প্রচার ক'রে দিলেন যে, লাল কাচে ঘেরা কোন ঘরের মধ্যে যদি বসন্ত-রোগীদের রাখা যায়, তবে তাদের নীরোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রণালীতে বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে বসন্তের চিকিৎসা হ'য়ে থাকে।



ମାଲିକ କୁମ୍ଭ



କେଶବ

আলোক চিকিৎসা

লাল কাচ দিয়ে ঘেরা ঘরে বসন্ত-রোগীদের রাখতে কেন বললেন তা হয়ত তোমরা সকলে বুঝতে পারো নি। সূর্যালোকের মধ্যে যে নীল বর্ণের রশ্মি আছে—সেটাই বসন্ত-রোগীদের ক্ষতি ঘটিয়ে থাকে। লাল আয়নার মধ্য দিয়ে সূর্যকিরণ যদি প্রবেশ করে, তবে লাল ভিন্ন-আলোকের অপর রশ্মিগুলো নষ্ট হ'য়ে যায়।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে ফিন্সেন তাঁর আবিষ্কৃত অতি-বেগুনীয়া রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ঐ রশ্মি আবিষ্কারের পর অনেকে মনে করেছিলেন যে, যক্ষ্মা প্রভৃতি জীবাণুঘটিত কঠিন ব্যাধিও ঐ রশ্মির সাহায্যে আরোগ্য করা যাবে। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেলো যে, তা সম্ভব নয়। কারণ ঐ রশ্মি প্রচুর পরিমাণে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। তার কারণ এই যে, ঐ রশ্মি দেহের মধ্যে যে লাল রক্ত আছে তা ভেদ ক'রে শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন লাল আয়নার মধ্য দিয়ে সূর্যের কিরণের অপর রশ্মি প্রবেশ করতে গিয়ে বিনষ্ট হ'য়ে যায়। সুতরাং শরীরের অভ্যন্তরে যে জীবাণুঘটিত ব্যাধি জন্মে ফিন্সেন সেগুলো নিরাময় করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, শরীরের উপরিভাগের ব্যাধিগুলো নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। তাতে তিনি কৃতকার্য হ'লেন। যক্ষ্মার জীবাণু

আলোক চিকিৎসা

যদি শরীরের চামড়াকে আক্রমণ করে, তবে লুপাস নামে এক প্রকার কঠিন রোগ জন্মে। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত রশ্মির সাহায্যে লুপাসের মত শক্ত ব্যাধিও আরোগ্য ক'রে দিলেন। এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারের জন্য দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি রটে গেলো। গলগণ্ড, ঘা, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি যে কোন চর্মরোগ ঐ আলোকের সাহায্যে সারিয়ে দেওয়া যায়। তা' ছাড়া আলোর সাহায্যে আরও বহুপ্রকার চর্মরোগ আরোগ্য করবার উপায় তিনি আবিষ্কার করেন।

আলোর সাহায্যে ব্যাধি আরোগ্যের নূতন উপায় আবিষ্কারের জন্য ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কোপেনহেগেনে ফিন্সেন একটা গবেষণাগার ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। সেখানে নানা প্রকার ছুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা ক'রে বহুরোগীকে তিনি আরোগ্য করেন। চিকিৎসায় আলোকের ব্যবহার সম্বন্ধে এই আশ্চর্য্য অভিনব প্রণালী আবিষ্কারের জন্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জীবনের শেষ দিকে তিনি এত অসুস্থ হ'য়ে পড়েন যে, বাড়ী থেকে কোথাও আর বেরুতে পারতেন না। এজন্য তিনি কখনও নিরুৎসাহ হ'ন নাই; অসুস্থ শরীর নিয়েই বিজ্ঞানের সেবায় জীবন কাটিয়েছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

রেডিয়ম

সন্ধ্যা তখনও শেষ হয় নাই। সুরম্য মহানগরী প্যারিসের পথে পথে সবেমাত্র তখন আলোক-মালার সমারোহ শুরু হয়েছে। ঠিক এমনি কালে সেখানকারই একটা বিরাট সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। “ন স্থান তিল ধারণং”—অর্থাৎ তিলটা মাত্র রাখবার মত যায়গাও আর সেখানে বাকী নেই। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী-গুণী এসে উৎসাহভরে আজ সেখানে ভিড় জমিয়েছেন।

.....কেন ?

কেন—সে কথাই বলছি। সেখানে আজ একজন বৈজ্ঞানিক তাঁরই আবিষ্কৃত একটা অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। বৈজ্ঞানিক নারী—এজন্মই লোকের কোতূহল আরও বেশী। কারণ তখন পর্য্যন্তও কোন নারী-বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-জগতে কোন মৌলিক আবিষ্কার করে, খ্যাতিলাভ করতে পারেন নি।

সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষায় বসে আছেন। কতক কাল কেটে যাবার পর সবার উৎকণ্ঠা দূর করে সভাগৃহে প্রবেশ করলেন এক সৌম্যমূর্তি তরুণী—সঙ্গে তার স্বামী। তিনিও একজন বৈজ্ঞানিক। উপস্থিত সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সসম্মানে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন।

রেডিয়ম

বৈজ্ঞানিক দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মঞ্চের উপরে গিয়ে বসলেন।

আবিষ্কৃত যে-পদার্থটী সম্বন্ধে তাঁরা বক্তৃতা করবেন বলে স্থির ছিল—সে-জিনিষটীও তাঁরা একটী কাঁচ-পাত্রে পূরে, সেই পাত্রটীকে একটা সীসার বাস্কে বন্ধ করে নিয়ে এসেছিলেন।

সভাস্থল নীরব-নিথর। বক্তৃতা আরম্ভ হলো। বৈজ্ঞানিক সীসার বাস্কে থেকে কাঁচপাত্রটীকে খুলে টেবিলের ওপরে রাখলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সভা-গৃহের সমস্ত বাতি নিবিয়ে দেওয়া হলো।—আর বাতি নেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেলো। যেন কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শে একটা তীব্র আলোক ধেরিয়ে আসতে লাগলো ঐ কাঁচ-পাত্রেরই ভেতর থেকে। কাণ্ড দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলো।

মঞ্চের ওপরে বৈজ্ঞানিকদের অতি নিকটেই বসে ছিলেন পারস্যের সম্রাট। সহসা অন্ধকারের মধ্যে এরূপ একটা তীব্র আলোক দেখে তিনি মনে মনে ভাবলেন—সভা-গৃহে হয়ত আগুন ধরে গেছে। তাই ভয় পেয়ে তিনি চেয়ার থেকে উঠে দূরে পালাতে গেলেন। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে তাঁর ধাক্কা লেগে কাঁচ-পাত্রটী মাটিতে পড়ে গেলো।

রেডিয়ম

এ ব্যাপারটি এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেলো—
যে বৈজ্ঞানিক প্রথম ব্যাপারটি মাত্রই বুঝতে পারেন
নি—পরে বুঝতে পেরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন।
তিনি ভাবলেন হয়ত তার বহু সাধনার ধন—অপূর্ব
এই জিনিষটি নষ্ট হতে চললো। অনিচ্ছাকৃত এই
ক্রটির জন্য পারস্যের সম্রাট অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে
পড়লেন। তিনি বৈজ্ঞানিকের এই ক্ষতি পূরণ
করবার জন্য তার হাতের বহুমূল্য হীরার আংটি খুলে
বৈজ্ঞানিককে দিতে এগিয়ে গেলেন। এর মধ্যেই
খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছিলো। সেই সম্রাট আংটি
দেবার জন্য এগিয়ে গেছেন তখনই জিনিষটি মাটি থেকে
উদ্ধার করে টেবিলের ওপরে রাখা হলো। সম্পূর্ণ
জিনিষটি মাটি থেকে উদ্ধার করে টেবিলের ওপর
রাখতে দেখে তিনি মনে মনে ভাবলেন, “যাক্ তাহ’লে
জিনিষটি নষ্ট হয় নি।” তিনি মস্ত বড় একটা লজ্জার দায়
থেকে মুক্তি পেলেন। কারণ টাকা-কড়ি বা হীরা-জহরত
দিয়ে ও জিনিষের মূল্য নির্ণয় হতে পারে না।.....এযে সাত
রাজার ধন এক মাণিক।

যাক্ এরপর আবার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুরু করলেন।
তার আবিষ্কারের সমস্ত কাহিনী এক এক করে সব বুঝিয়ে

রেডিয়ম

বলতে লাগলেন। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে যে বিজ্ঞান জগতে আরও কত নূতন নূতন গবেষণা ও আবিষ্কার করবার পথ মুক্ত হলো তা-ও তিনি বলে গেলেন। এ জিনিষের সাহায্যে পৃথিবীর কত ভাবে যে উপকার করা সম্ভব হবে সে কথাও বললেন। বহুক্ষণ ধরে বক্তৃতা হলো। শ্রোতারা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্বাক হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনে গেলো। যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রাণ খুলে এই মৌলিক আবিষ্কারের প্রশংসা করলেন। পারস্যের সম্রাট এই অদ্ভুত পদার্থটির আশ্চর্য্য গুণাবলীর কথা শুনে এমনি খুসী হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর দেহ থেকে বহুমূল্য রাজপোষাক খুলে বৈজ্ঞানিককে পরিবেশ দেবার জন্তু এগিয়ে গেলেন। এতে বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। কারণ বহুমূল্য রাজ-পরিচ্ছদে তাঁর কোন প্রয়োজন ছিলো না। গবেষণাগারের নিভৃত কক্ষে বসে গবেষণা করতে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেই তিনি পছন্দ করতেন—অদৃশ্বর করা ছিল তাঁর নীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং রাজ-পরিচ্ছদে তাঁর কি প্রয়োজন?

এই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও তাঁর আবিষ্কৃত এই আশ্চর্য্য পদার্থটির নাম জানতে এখন নিশ্চয়ই হয়ত তোমাদের জানা কৌতূহল হচ্ছে।—এই বৈজ্ঞানিকের নাম

বিজ্ঞানের গল্প

রেডিয়ম

মাদাম কুরী—আর তাঁর আবিষ্কৃত পদার্থটির নাম রেডিয়ম ।

রেডিয়ম আবিষ্কার করে মাদাম কুরী এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন । তোমাদের কাছে পূর্বে রনজেন-রশ্মি বা X-Ray এর কথা বলেছি । সে প্রসঙ্গে রনজেন্ রশ্মি যে কিরূপ আশ্চর্য্য তীব্র তেজসম্পন্ন সেকথাও তোমরা শুনেছ । কিন্তু রেডিয়মের রশ্মি রনজেন্ রশ্মির চেয়েও অধিক তীব্র ও উজ্জ্বল । এর রশ্মিও রনজেন্ রশ্মিরই মত মানুষের শরীরের মধ্যে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করতে পারে ।

এই আশ্চর্য্য পদার্থটি আবিষ্কার করে, মাদাম কুরী যে সমগ্র মানবজাতির কি এক আশ্চর্য্য ও মহৎ উপকার করে গেছেন, সে কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না । এজন্য সমগ্র মানবজাতি তাঁর কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকবে । তোমরা ক্যান্সার (Cancer) বা কৰ্কট রোগের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ । এ ব্যাধি রেডিয়ম আবিষ্কারের পূর্বে পর্য্যন্ত ছিল “শিবেরও অসাধ্য ।” কিন্তু রেডিয়ম আবিষ্কারের পর থেকে এই নিদারুণ ব্যাধি আরোগ্য করা সম্ভবপর হয়েছে । রেডিয়মের চিকিৎসা (Radium Treatment) ছাড়া এই ভীষণ ব্যাধি আরোগ্য করা কোনরূপেই সম্ভব নয় । সুতরাং তোমরা হয়ত এখন বুঝতে

রেডিয়ম

পারছে। রেডিয়ম আবিষ্কারের ফলে মানবজাতির কী কল্যাণ সাধিত হয়েছে! শুধু কি তাই? তা নয় এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতেও নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হয়ে বৈজ্ঞানিকদের বহুকালের বহু প্রাচীন সব বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়েছে। আরও যে কত কি হবার সম্ভাবনা আছে তা-ই বা কে বলতে পারে।

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা যায়—পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু কি? তোমরা হয়ত বলবে—সোনা। আর তোমাদের মধ্যে যারা একটু বেশী খোঁজখবর রাখ— তারা খুব বেশী যদি হয় ত বলবে—প্ল্যাটিনাম; কিন্তু তা নয়। তোমাদের এ ধারণা যদি থেকে থাকে তবে তা' বদলে নিও। কারণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু হচ্ছে রেডিয়ম। রেডিয়মের নাম তোমরা হয়ত এই প্রবন্ধ পড়েই প্রথম জানলে। এর পূর্বে যদিও বা তোমরা কেউ এ নামটী শুনে থাক—কিন্তু এ জিনিষটী যে তোমরা কেউ দেখ নাই এ কথা সত্যি। কারণ এ জিনিষ যেখানে সেখানে দেখতে পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে-পরিমাণ রেডিয়ম সংগৃহীত হয়েছে তা খুবই অল্প। তার ওজন কয়েক তোলা মাত্র হ'বে। ইচ্ছা করলে ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের বাস্কের মধ্যেই তা পূরে বন্ধ করে

রেডিয়ম

রাখা যায়। খুব বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বলেই এই জিনিষটী এমনি দুর্শ্মূলা।

রেডিয়ম সত্যি সত্যি এক অদ্ভুত পদার্থ। এর যে কিরূপ তীব্র আলো দেওয়ার শক্তি আছে তা ত তোমাদের পূর্বেই বলেছি। অন্ধকারের মধ্যে এ জিনিষটী একেবারে জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন খুব বেশী শক্তির একটা বিজলী বাতি জ্বলছে। রেডিয়মের শুধু যে আলো দেওয়ারই ক্ষমতা আছে তা নয় এর তাপ দেওয়ারও শক্তি আছে। এক তোলা পাথুরে কয়লা পোড়ালে যে পরিমাণ তাপ পাওয়া যেতে পারে, ঐ পরিমাণ রেডিয়ম থেকে ওর দশলক্ষগুণ বেশী তাপ পাওয়া যাবে।

এ কথা শুনে তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবছো—এর একটা টুকুরো যদি কোনরকমে পাওয়া যেত তা হ'লে কী মজাটাই না হোত! সকাল বেলায় উঠে চায়ের জল গরম করবার জন্তু আর ষ্টোভ্ ধরাবার হাঙ্গামাটা পোয়াতে হতো না। কিন্তু তা-ও কি সম্ভব? না তা নয়। কারণ রেডিয়ম এমনি দুপ্রাপ্য জিনিষ যে, এর অভাবে পৃথিবীর বহু হাসপাতালে ক্যানসারের মত ব্যাধির চিকিৎসার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ধরে নাও,

রেডিয়ম

যদিও বা ওর একটা টুকরো পাওয়া যায়—তা হ'লে চায়ের জল গরম তা দিয়ে করা সম্ভব হবে না। কারণ সুস্থ মানুষের শরীরের মধ্যে যদি কোনক্রমে রেডিয়মের একটা সামান্য পরমাণুও প্রবেশ করতে পারে তা হ'লে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটা অসম্ভব নয়। সুতরাং এ জিনিষ নাড়াচাড়া করবার অনেক বিপদ আছে। দেখলে কেমন অদ্ভুত এই পদার্থটা। এর সাহায্যে ব্যাধি নিরাময়ও করা যায় আবার সুস্থ শরীরে প্রবেশ করলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়ে দেয়।

এই আশ্চর্য্য জিনিষটা যিনি আবিষ্কার করে গেভেন তাঁর জীবন-কথা ও কি করে তিনি এই জিনিষটা আবিষ্কার করলেন তা নিশ্চয়ই তোমরা জানতে চাও। এই আবিষ্কারের পেছনে বৈজ্ঞানিকের কিরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা ও কস্মপ্রেরণা যে ছিল সে কথা শুনলে তোমরা অবাক হ'বে। সেই কাহিনীই তোমাদের বলছি।

মাদাম কুরীর জন্ম হয় পোল্যান্ডের এক দরিদ্র পরিবারে। যদিও তাঁর বাবা পোল্যান্ডের ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন, তবু তাঁদের অভাব ছিল যথেষ্ট। কারণ যোগ্যতার হিসেবে মাদাম কুরীর বাবা মাইনে ভারী কম পেতেন। তাঁর মা-ও একটা মেয়েদের

রেডিয়ম

কলেজে কাজ করতেন। তার মাইনেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। কাজে কাজেই অভাব তাদের লেগেই ছিল। মাদাম কুরীর কুমারী অবস্থায় নাম ছিল মেরী স্কোভাউস্কী। বিয়ে হওয়ার পর তিনি স্বামীর কুরী উপাধি গ্রহণ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার দিকে মেরীর খুব বেশী ঝোঁক ছিল—বিশেষতঃ বিজ্ঞানের চর্চায়। সাংসারিক অভাব অনটন ও আরও নানারকম অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়ার দিকে তার কোনরূপ অমনোযোগ কখনও দেখা যায় নি। যার মা ও বাবা দু'জনেই শিক্ষাব্রতী তার পক্ষে এ রকম হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকেই মেরী বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে, তার বাবার কাছে লেবরেটরীতে বসে বসে মনোযোগের সঙ্গে বিজ্ঞানের অনুশীলন করতেন। এ রকম ভাবে অতি অল্প বয়সেই মেরী বিজ্ঞানে বেশ জ্ঞানলাভ করে ফেললেন।

এই সময়ে নানা কারণে তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল হয়ে পড়ে—অভাব অনটন বেড়ে যায়। মেরীর বাবা আর কোন উপায় না দেখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে তাকে লেবরেটরীর একটা অল্প মাইনের চাকুরী

রেডিয়ম

নিয়ে দিলেন। এতে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা কতকটা দূর হলো বটে কিন্তু আর এক বিপদ এসে জুটলো। এই সময় পোল্যান্ড ছিল রাশিয়ার অধীনে। কোন কারণে মেরী রাশিয়ার সম্রাটের বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন। আর ভারি ফলে তার নির্বাসন দণ্ড হলো। অল্প বয়সেই তাকে জনক-জননী ও আবালায় পরিচিত স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করতে হলো। ঘুরতে ঘূবতে অত্যন্ত নিঃস্ব অবস্থায় মেরী ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন।

এরূপ ভীষণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েও কিন্তু তার জ্ঞান অর্জন করবার অদম্য স্পৃহা মাত্রও কমলোনা। তিনি স্থির করলেন যে, প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে, আবার পড়াশুনো শুরু করবেন। কিন্তু পড়াশুনো করতে হলে'ত টাকা পয়সার প্রয়োজন। সে টাকা আসবে কোথা থেকে? এই চিন্তায়ই মেরী ভারী বিব্রত হয়ে পড়লেন। যাদের চেষ্টা থাকে সঙ্গে সঙ্গে ভগবানই তাদের উপায় মিলিয়ে দেন। সামান্য কিছু টাকা অতি কষ্টে সংগ্রহ করে মেরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলেন। এবার দারিদ্র্যের সঙ্গে তার শুরু হলো তুমুল সংগ্রাম। অতি কষ্টে তিনি যা কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করতেন, তা দিয়ে প্রথমেই কিনতেন বই তারপর যদি

রেডিয়ম

কিছু বাঁচতো তবে অণু ব্যয় করতেন। এজন্য অনেক সময় তাঁকে একবেলা আহার করে এবং কখনও কখনও অনাহারে পর্যন্ত থাকতে হয়েছে। কিন্তু মেরী সে ক্লেশকে ক্লেশ বলেই মনে করেন নি। এমনি অদ্ভুত ছিল তাঁর বিদ্যার প্রতি অনুরাগ!

এখানে পেরী কুরী নামে একজন তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে মেরীর পরিচয় হয়। সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে এই যুবক অধ্যাপকের পদলাভ করেছিলেন। মেরীর এরূপ অদ্ভুত প্রবল বিদ্যানুরাগ অধ্যাপক কুরীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এই অধ্যাপকটি রসায়ন শাস্ত্রে ছিলেন পরম পণ্ডিত। মেরীর আর্থিক অসচ্ছলতা যাতে দূর হতে পারে—যাতে শান্তিতে অনন্যমনা হয়ে তিনি পড়াশুনো করতে পারেন—অধ্যাপক কুরী সেজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন। একটা সুযোগও মিলে গেলো। এই সময় বিজ্ঞানের গবেষণাগারের একটা সহকারীর পদ খালি হলো। এ কাজ অধ্যাপক কুরীর সহকারীরই কাজ। অধ্যাপক কুরী চেষ্টা করে মেরীকে এই কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। এবার মেরীর অর্থাভাব বহুল পরিমাণে দূর হলো। পরবর্তী কালে এই অধ্যাপক পেরী কুরীর সঙ্গেই মেরীর বিয়ে হয়েছিল।

রেডিয়ম

রেডিয়ম সম্বন্ধে সব কথা জানবার আগে গোড়ার দিককার কিছু কথা ভালো করে জেনে না নিলে, সব কথা বোঝবার সুবিধে হবে না। এক্স রে বা রন্‌জেন্‌ রশ্মির আবিষ্কারের গল্প তোমাদের পূর্বেই বলেছি। এই এক্স বে যখন আবিষ্কৃত হলো, তখন বৈজ্ঞানিক মহলে রীতিমত ছলুস্থল শুরু হয়ে গেলো—এই ধরনের অধিকতর তীব্র তেজসম্পন্ন আরও কোন রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাই নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে রীতিমত গবেষণা আরম্ভ হলো। এরই ফলে আবিষ্কৃত হলো ইউরেনিয়ম সালফেট বলে একটি পদার্থ। এ জিনিষটিরও আলো দেওয়ার শক্তি আছে। আর এর আলোও অনেকটা রন্‌জেন রশ্মিরই গুণ-সম্পন্ন। এ জিনিষটি আবিষ্কার করেন একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক—নাম বেকেরেল। তাঁরই নাম অনুসরণ করে এই রশ্মির নামকরণ করা হলো বেকেরেল রশ্মি। এই ইউরেনিয়ম সালফেট জিনিষটি আবিষ্কৃত হয়েছিল পিচব্লেন্ড বলে এক রকম খনিজ পদার্থের মধ্যে।

গবেষণায় বেকেরেল যে-প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন সেই প্রণালী অনুসরণ করেই মাদাম কুরী গবেষণা আরম্ভ করলেন—উদ্দেশ্য আরও উজ্জ্বল কোন রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা! পিচব্লেন্ড নিয়ে মাদাম কুরীও পরীক্ষা শুরু

রেডিয়ম

করলেন। কিছুকাল পরীক্ষার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইউরেনিয়ম ছাড়া অন্য এক প্রকার পদার্থ থেকেও ঐ প্রকার রশ্মি পাওয়া যায়। তিনি তার নাম দিলেন থোরিয়ম। আরও পরীক্ষা করবার পর তিনি বুঝলেন যে, বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম অপেক্ষা যে খনিজ পদার্থে (পিচব্লেন্ড) ইউরেনিয়ম পাওয়া যায়, তার আলো দেওয়ার শক্তি বেশী। এই থেকেই তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, পিচব্লেন্ডের মধ্যে ইউরেনিয়ম ছাড়া এমন আরও কোন পদার্থ আছে, যার ফলেই এরূপ হওয়া সম্ভব হয়। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, তাঁর বিশ্বাস যদি সত্য হয় তা হ'লে জগতের লোক তাদের কাছ থেকে এমন একটা নূতন কথা জানতে পারবে যা এর পূর্বে আর কেউই শোনাতে পারে নি। এ ব্যাপার বুঝতে পেরেই তিনি আর একটা অপূর্বে আবিষ্কারের কল্পনায় একেবারে মেতে উঠলেন।

পূর্বে তাঁর কোন সহকর্মী ছিল না। এখন অধ্যাপক কুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ার তাঁকে তিনি সহকর্মীরূপে পেলেন। তোমাদের পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক কুরী রসায়ন শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর সাহায্য মাদাম কুরীর ভারী কাজে এলো। স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে এই পিচব্লেন্ড নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ

রেডিয়ম

করলেন। কী দারুণ মনোযোগ তাদের কাজে! দিন নেই রাত্রি নেই তাঁরা শুধু পরীক্ষার পর পরীক্ষাই করে চলেছেন।

কিছুকাল পরীক্ষা করবার পর তাঁরা আর একটা জ্যোতির্ময় পদার্থের সন্ধান পেলেন। মাদাম কুরীর মাতৃভূমি পোল্যান্ডের নাম অনুসারে এর নাম দিলেন তাঁরা পোলোনিয়ম। ঠিক যে-জিনিষটা তাঁরা পিচব্লেন্ডের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারবেন বলে আশা করে কাজ শুরু করেছিলেন পোলোনিয়ম সে জিনিষ নয়। সুতরাং তাঁরা আবার নূতন উৎসাহে কাজ শুরু করলেন। আবার পিচব্লেন্ড বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করা আরম্ভ হলো। কিন্তু তাদের এই গবেষণার কাজে মস্তবড় অন্তরায় হলো তাঁদের দারিদ্র্য। একে পিচব্লেন্ড অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু তাতে বহু পরিমাণ পিচব্লেন্ড একসঙ্গে সংগ্রহ করে না নিতে পারলে কাজের মাত্রই সুবিধা হয় না। প্রচুর অর্থব্যয় করে একসঙ্গে বহু পরিমাণ পিচব্লেন্ড সংগ্রহ করে নেওয়া তাঁদের পক্ষে এক রকম কঠিন হয়ে উঠলো। এই গবেষণায় তাঁদের অত্যন্ত উৎসাহ লক্ষ্য করে ভিয়েনার বিজ্ঞান-পরিষদ তাঁদের এক টন পিচব্লেন্ড উপহার দিলেন। এবার কাজের অনেকটা সুবিধা হলো। এইভাবে বারো বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে পিচব্লেন্ডের

রেডিয়ম

মধ্যে তাঁরা এক স্বতঃ-জ্যোতির্ষয় পদার্থ আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। এই পদার্থের নামই দিলেন তাঁরা রেডিয়ম। অধ্যাপক কুরীর আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। সুতরাং এই বারো বৎসর কাল দারিদ্র্যের সঙ্গেও তাঁদের অতি কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে; এমন কি অনেক দিন ছু'বেলা আহার্য পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। তবু তাঁরা নিরুৎসাহ হ'ন নি। শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ উদ্যমে চেষ্টা করেছেন।

রেডিয়ম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দেশে কুরী দম্পতির নাম ছড়িয়ে পড়লো। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞান-পরিষদ ও সভা থেকে তাঁদের নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো এই বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করবার জন্ম। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের স্বর্ণপদক ও অর্থ পুরস্কার দিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁদের এই বিখ্যাত আবিষ্কারের জন্ম তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

এই আবিষ্কারের পরও মাদাম কুরী এবং তাঁর স্বামী অধ্যাপক কুরী নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। নব নব আবিষ্কার করে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করবার চেষ্টায় নব উদ্যমে ব্রতী হলেন।

রেডিয়ম

কিন্তু এহ সময় সহসা বিনামেঘে বজ্রপাত হলো। ১৯০৬ সালে একদা রাজপথে ভ্রমণ-কালে মোটর গাড়ীর নীচে পড়ে, অধ্যাপক কুরীর লোকান্তর ঘটলো। স্বামী ও সহকর্মীর এই অস্বাভাবিক ও আকস্মিক মৃত্যুতে মাদাম কুরীর প্রাণ-মন হাহাকার করে কেঁদে উঠলো। বলতে ভুলে গিয়েছি এর মধ্যে মাদাম কুরীর দু'টী কন্যা জন্মেছিলো। সেই শিশু কন্যা দু'টীকে স্নেহভরে বুকে চেপে, তিনি স্বামীর শোক ভুলতে চেষ্টা করলেন। মাদাম কুরী এর পর স্থির করলেন যে, যে-বিজ্ঞান তাঁর স্বামীর অতি প্রিয় ছিল তারই সেবায় তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করবেন।

এপর্যন্ত তোমাদের কাছে রেডিয়ম আবিষ্কার করবার কাহিনীই বলেছি। কিন্তু এ জিনিষটী যে কি সেকথা সম্পষ্ট করে এখনও তোমাদের বলা হয় নি।

পূর্বে বলেছি রেডিয়মের তাপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে— রেডিয়ম স্বতঃ-জ্যোতির্ময় পদার্থ এবং এর সাহায্যে কর্কট বা ক্যানসার নামক ছুরারোগ্য ব্যাধি অতি সহজে নিরাময় করা যেতে পারে।—এই কথাগুলোই পরিষ্কার করে তোমাদের এখন বুঝিয়ে বলে, এই প্রবন্ধ শেষ করবো।

একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের ভাষায় তোমাদের কাছে রেডিয়মের বর্ণনা দিচ্ছি। তিনি বলেছেন—“রেডিয়মের এক

রেডিয়ম

আশ্চর্য্য গুণ এই যে এর থেকে তেজ বিকীর্ণ হচ্ছে—
রেডিয়মের মধ্যে যেন অফুরন্ত তেজের ভাণ্ডার আছে—
কুবেরের ধন,—দান করলেও ক্ষয় নাই! কোন উত্তপ্ত বস্তু
তেজ বিকীর্ণ করে শীতল হয়—তার তেজের ভাণ্ডার নিঃস্ব
হয়ে যায়—কিন্তু রেডিয়মে যেন তা হয় না। এক কণা রেডিয়ম
থেকে এত তেজ বের হয় যে, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সেই
তেজ রেডিয়ম কণার সমান পরিমাণ জলকে ফুটন্ত অবস্থায়
আনতে পারে। অথচ আপাত দৃষ্টিতে তাপ বিকীর্ণের
জন্য রেডিয়মের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।
এই তেজের উৎস কোথায়? বৈজ্ঞানিক বলেন যে,
রেডিয়মের এক একটা পরমাণু মাঝে মাঝে বিদীর্ণ হচ্ছে
—কেন হচ্ছে তার কারণ জানা নেই। আর এই ভাবে
বিদীর্ণ হওয়ার উপর মানুষের কোন হাত নেই। মানুষ
তার আয়ত্তাধীন কোন শক্তির প্রয়োগে এই বিদীর্ণ হওয়া
নিবারণ করতে বা বাড়াতে পারে না। রেডিয়ম ধাতুর
পরমাণু এইরূপে বিদীর্ণ হয়ে অন্য ধাতুর পরমাণুতে পরিণত
হয় আর সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি তেজরূপে
বিকীর্ণ হয়।” রেডিয়মের এই অদ্ভুত শক্তির কথা শুনে
তোমরা হয়ত খুবই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ? তোমরা হয়ত
মনে মনে ভাবছো—“কেন এমন হয়?” এর উত্তরে যে

রেডিয়ম

কথাগুলো বলতে হয় সে সব কথা—হয়ত তোমরা ভালো ধরে বুঝবে না। তাই সংক্ষেপেই বুঝিয়ে বলছি।

আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পঞ্চভূতে মিলে এই পৃথিবীর সব কিছুই তৈরী হয়েছে। এই পঞ্চভূত হচ্ছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পাহাড় পর্বত, নদী, সমুদ্র, গাছপালা, জীবজন্তু সব কিছুই এই পঞ্চভূতে তৈরী। সুতরাং এগুলোই হচ্ছে মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ সব কিছু তৈরীরই উপাদান এগুলো। পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই এই পাঁচটি উপাদানে বা এর সংমিশ্রনে প্রস্তুত হয়েছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিশ্বাস এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু অন্তরকম ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলতেন—চারটি মাত্র মৌলিক উপাদান এই পৃথিবীতে আছে—আর তাই দিয়েই পৃথিবীর সব কিছু তৈরী হয়েছে। সে চারটি উপাদান মাটি, জল, আগুন ও বাতাস।

কিন্তু কিছুকাল যাবার পর বৈজ্ঞানিকেরা বলতে লাগলেন এর কোনটাই মৌলিক পদার্থ নয়। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলো বায়ব পদার্থ এবং গন্ধক, তামা, লোহা, সোণা, রূপা, পারদ প্রভৃতি কতকগুলো তরল ও কঠিন পদার্থই

রেডিয়ম

পৃথিবীর সব কিছুর উপাদান এবং এগুলোই মৌলিক পদার্থ।
মৌলিক পদার্থের সংখ্যা হচ্ছে বিরানব্বই।

ডেল্টন নামে একজন বৈজ্ঞানিক বললেন, যে, যদি এক টুকরো সোনা বা লোহা নিয়ে ক্রমাগত শুধু গুঁড়ো করা যায় তা হ'লে শেষ পর্যন্ত যে জিনিষটা পাওয়া যাবে, সেটাও ঐ পদার্থেরই সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কণা বা পরমাণু ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আর কোনরূপ রূপান্তর হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং এই পরমাণুগুলোই হচ্ছে প্রত্যেক জিনিষের মৌলিক উপাদান। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের—যেমন সোনা বা রূপার—পরমাণু বিভিন্ন। সুতরাং এর মৌলিক উপাদানও বিভিন্ন। বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এ বিশ্বাসেরও পরিবর্তন হলো।

পরীক্ষায় “পরমাণু-সিদ্ধান্ত” ভুল বলে প্রমাণিত হলো। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করলেন, পরমাণুরও পরমাণু আছে আর সেই পরমাণুই হচ্ছে মৌলিক পদার্থ। এক জিনিষের পরমাণুর সঙ্গে অপর জিনিষের পরমাণুর একেবারেই প্রভেদ নেই। সুতরাং পৃথিবীর সব কিছু তৈরীরই মৌলিক উপাদান এক। এমনি এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা বেশ বোঝা যায়।

রেডিয়ম

একটা কাঁচের গোলকে সামান্য চাপে কোন গ্যাস ভর্তি করে, তার ভেতর দিয়ে যদি বিদ্যুত-প্রবাহ চালানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে, গোলকের অপর দিক থেকে এক রকম নীল আভাযুক্ত রশ্মি বেরিয়ে আসছে। পরীক্ষা করে দেখা গেলো যে, এই রশ্মি বিদ্যুতের বাহন। আর এই রশ্মি অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পদার্থ কণা দিয়ে তৈরী। বৈজ্ঞানিকেরা আবার পরীক্ষা আরম্ভ করলেন যে, বিদ্যুতের বাহন এ জিনিষটা কি? পরীক্ষায় স্থির হলো যে, এগুলোও সূক্ষ্ম বিদ্যুতের কণা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জে. জে. টমসন এর একটা ওজনও ঠিক করে ফেললেন। এর ওজন অতি সামান্য। হাইড্রোজেনের পরমাণুর ১৮৫০ ভাগের একভাগ মাত্র। এই জিনিষটাই হচ্ছে পৃথিবীর সকল পদার্থের একমাত্র উপাদান। যা কিছু তোমরা দেখতে পাও সবই এই জিনিষটা দিয়েই তৈরী। বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিয়েছেন ইলেক্ট্রন বা বিদ্যুতিন।

রেডিয়মের ভেতর থেকে অবিরত যে আলো ও তাপ বেরিয়ে আসছে তা এই বিদ্যুতিন ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা এখন প্রশ্ন করতে পার পৃথিবীর সব কিছুই যখন বিদ্যুতিন দিয়ে তৈরী তখন সব জিনিষের ভেতর থেকেই রেডিয়মের মত অবিরত আলো ও তাপ বেরোয় না কেন?

রেডিয়ম

তা সম্ভব নয়। কারণ এই বিদ্যুতিনগুলো একটা প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ থাকে। এই প্রাচীর অতিক্রম করে বিদ্যুতিনের ছুটে আসা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। যে সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়—সে ক্ষেত্রে তারা বেরিয়ে এসে ক্রমে নূতন করে আবার একটা পদার্থ সৃষ্টি করে ফেলে। এই হিসেবে রেডিয়মকে পরিবর্তনশীল ধাতু বলা চলে। কারণ রেডিয়মের ভেতর থেকে প্রতি মুহূর্তে ভীষণ বেগে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতিন ছুটে বেরিয়ে আসছে। এই ছুটে বেরুবার বেগ এমনি ভীষণ যে, তা আমরা কল্পনাও আনতে পারি না। বিদ্যুতিন প্রতি সেকেন্ডে দেড়লক্ষ মাইল বেগে ছুটে বেরায় এবং সম্পূর্ণ অণু মৌলিক জিনিস তৈরী করে ফেলে।

রেডিয়ম থেকে যেমন অণুাণু মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হয়, রেডিয়মও তেমনি ঐ ভাবেই জন্মে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, খনির যে জায়গায় ইউরেনিয়ম পাওয়া যায় তার চারদিকে রেডিয়মও কিছু কিছু জমে থাকে। ইউরেনিয়ম যখন বিদ্যুতিন ত্যাগ করতে করতে ক্ষয় পেয়ে যায় তখনই লঘুতর ধাতু রেডিয়মের সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপার লক্ষ্য করেই বৈজ্ঞানিকদের মনে একটা বিশ্বাস জন্মেছে যে, কালে হয়ত কঠিনতর ধাতুকে লঘুতর ধাতুতে পরিণত করা অসম্ভব হবে না। সীসা সোনা অপেক্ষা লঘুতর।

রেডিয়ম

সুতরাং সীসা যদি কালে সোনাতে পরিণত হয়, তবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই থাকবে না। এখন হয়ত ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ।

এবারে রেডিয়মের সাহায্যে কি করে ক্যান্সার বা কৰ্কট রোগ আরোগ্য করা হয় সেই কথাই তোমাদের বলবো। যে-সমস্ত চিকিৎসালয়ে রেডিয়ম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে সেখানে প্লাটিনাম ধাতুতে তৈরী ছোট ছোট ফাঁপা সূঁচ রাখা হয়। সূঁচের ফাঁপা জায়গায়টা রেডিয়মের কয়েকটা কণা দিয়ে ভর্তি করে, সেই সূঁচটিকে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত স্থানে প্রবেশ করিয়ে কয়েকদিন রাখা হয়। প্লাটিনাম ভেদ করে রেডিয়মের তীব্র রশ্মি বেরিয়ে এসে আক্রান্ত কোষ-সমূহকে আঘাত করতে করতে ক্রমে সুস্থ করে তোলে। এইরূপেই এই মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রেডিয়ম থেকে প্রতিনিয়ত যে রশ্মি তীব্রবেগে ছুটে বেরিয়ে আসছে, বৈজ্ঞানিকেরা তাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে তার নাম দিয়েছেন আল্ফা, বিটা ও গামা। এই তিনটি রশ্মির মধ্যে গামা রশ্মিই সব চেয়ে বেশী তীব্র। এই কারণে চিকিৎসায় এই রশ্মিই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। এই রশ্মির তেজ এত বেশী যে পুরু সীসার পাত ভেদ করে পর্য্যন্ত বেরিয়ে যেতে পারে। নানা রোগেই আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা

রেডিয়ম

রশ্মি-চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। আর তার ফলও খুবই ভাল হচ্ছে।

এই কারণে আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই রেডিয়মের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী রেডিয়ম সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর হচ্ছে না। কারণ রেডিয়মের মত ছুপ্রাপ্য জিনিষ বোধহয় পৃথিবীতে আর বেশী নেই।

প্রতিনিয়ত রেডিয়ম থেকে আলোক বেরোয় বলে আজকাল নানা কাজেই রেডিয়মের ব্যবহার শুরু হয়েছে। তোমরা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র কাকে বলে তা হয়ত জান। এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রে যে সব কাঁটার সাহায্যে দিকগুলো দেখানো হয়, সেগুলোতেও আজকাল রেডিয়ম ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়াও বৈজ্ঞানিকেরা আরও নানা কাজে এ জিনিষটির ব্যবহার আরম্ভ করেছেন।

অন্যান্য মৌলিক আবিষ্কারের জন্ম মাদাম কুরীকে আরও একবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ছ'বার নোবেল পুরস্কার লাভ আর কোন বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটে নি।

মাদাম কুরী আজ আর বেঁচে নেই বটে কিন্তু তিনি এই আবিষ্কার করে বিজ্ঞানকে যে-ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন এবং এর ফলে মানুষের যে মহৎ উপকার সাধিত হয়েছে, তার জন্ম যুগ যুগ ধরে লোকে তাঁকে স্মরণ করবে।

রেডিয়ম

মাদাম কুরীর প্রণালী অনুসরণ করে আজকাল আরও অনেক বৈজ্ঞানিক কয়েকটি স্বতঃ জ্যোতিষ্ময় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন সত্য কিন্তু সেগুলো রেডিয়মের মত তত তীব্র তেজ সম্পন্ন নয়।

রেডিয়ম-বিজ্ঞানের আলোচনার জন্ম আজকাল পদার্থ বিজ্ঞানের একটা নূতন বিভাগ গড়ে উঠেছে। এই বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে “রেডিও এক্টিভিটি।” বৈজ্ঞানিকেরা আশা করছেন যে, বিজ্ঞানের এই বিভাগের গবেষণার ফলে কালে হয়ত বা এমন সব অসাধ্য সাধিত হবে যা মানুষ স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করতে পারে নি।

আকাশ কেন নীল ?

সুদূর বিস্তৃত আকাশ—দূরে—আরও দূরে যতদূর দৃষ্টি চলে—শুধু দেখা যায় নীল আর নীল—যেন সেখানে নীল বর্ণের একটা মহোৎসব শুরু হয়েছে।

আকাশে নীলবর্ণের এ বিরাট সমারোহেব কি কারণ ?

আকাশের গায়ে নীল বর্ণের এই আশ্চর্য্য প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করে, কবি মুগ্ধ হয়ে ছন্দে ও গানে এর বন্দনা-গীতি গেয়েছেন, দার্শনিক এর মাঝে ভগবানের মহিমার অপরূপ বিকাশ দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে বারংবার তাঁরই চরণে প্রণতি জানিয়েছেন। কিন্তু এর সত্যিকার যে কারণ তা নির্ণয় করেছেন বৈজ্ঞানিক। এই কারণই তোমাদের বলছি।

এর কারণ আর কিছুই নয়, এ-ও আমাদের সে-ই চির-পরিচিত সূর্যের আলোরই একটা কারসাজী মাত্র। পূর্বে “আলোক চিকিৎসা” প্রবন্ধে আলোক সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাদের বলেছি। তোমরা সেই প্রবন্ধেই পড়েছ, খালি চোখে এমনি সূর্যের আলোককে সাদা বলে মনে হলেও এতে সাতটা বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ আছে। এই বর্ণ-সমূহকেই কহে বর্ণচ্ছত্র (Spectrum)। আলোকের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধেও অনেক কথা তোমরা পূর্বেই জেনে

আকাশ কেন নীল ?

নিয়েছ। ইথারের ছোট বড় নানারকম টেউ থেকে যে কি ভাবে নানা শ্রেণীর আলোর জন্ম হয়ে থাকে, সে কথাও এখন আর তোমাদের কাছে কিছু নূতন নয়। এখন তোমাদের কাছে আলোকের সম্বন্ধে আর একটা নূতন কথা বলছি।

সূর্যের আলোকে যদি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ না-ই থাকতো তবে আমরা হয়ত পৃথিবীতে আর নানা রঙ-বেরংয়ের চমৎকার সব জিনিস দেখতে পেতাম না। রঙীন পাখাওয়ালা প্রজাপতি, বিভিন্ন বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুল, গাছপালা সবই হয়তো আমাদের চোখের ওপরে উৎকট কালো হয়ে ফুটে উঠতো। আচ্ছা, তাহলে একবার ভেবে দেখতো অবস্থাটা কি হতো? পৃথিবীর এমন অপরূপ সৌন্দর্য—বর্ণে বর্ণে যার অপূর্ব প্রকাশ তা আমরা কি আর সুন্দর বলে মনে করতে পারতাম। এ ব্যাপার হলে যে পৃথিবীতে আমাদের টেকাই দায় হয়ে উঠতো।

কথাটা শুনে তোমরা হয়ত একেবারে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছ। কেমন তাই নয় কি? তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবছো এ আবার কেমন কথা হলো। পৃথিবীর বিভিন্ন বর্ণের জিনিসের সঙ্গে সূর্যের আলোর রশ্মির আবার এমন একটা কি সম্পর্ক আছে যার ফলে ওরূপ হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যা বলেছি তা একেবারে সম্পূর্ণ

আকাশ কেন নীল ?

সত্যি—এতে কোথাও ফাঁকির লেশমাত্রও নেই। সূর্যের আলোকের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন বর্ণের জিনিষের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিষের ওপর সূর্যের আলোর প্রতিফলনের ফলেই এই আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে থাকে। কথাটা হয়ত তোমরা ঠিক বুঝলে না ! কথাটা একটু বুঝিয়েই বলছি।

কোন একটা পাতলা জিনিষকে যদি একটা শক্ত জিনিষের গায় ছুঁড়ে মারা যায়, তাহলে সেটা লাফিয়ে আবার ফিরে আসে। যেমন ধর, একটা রবারের ফাঁপা বলকে নিয়ে, তুমি একটা পাথরের ওপর ছুঁড়ে মারলে—তাহলে তার ফল কি হবে ! ঐ বলটা কি ছিটকে লাফিয়ে ফিরে আসবে না ! নিশ্চয়ই আসবে। আলোকের সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা খাটে। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে দেখেছ যে সূর্যের রশ্মি যদি কাঁচ বা ঐরকম কোন চক্চকে জিনিষের ওপরে পড়ে, তাহলে সেই রশ্মি ঠিকরে পড়ে। কেন পড়ে তা পরে বলছি। একই বলে আলোকের প্রতিফলন !

বিভিন্ন জিনিষের ওপর আলোকের বিভিন্ন প্রকার প্রতিফলন হয়ে থাকে। তোমরা জান যে, আলোকের গতির বেগ অতি দ্রুত। প্রতি মুহূর্তে আলোক বহুদূর চলে যেতে পারে। আলোক দ্রুত গতিতে চলতে চলতে

আকাশ কেন নীল ?

যখনই এসে কোন জিনিষের গায়ে বাঁধা পায়, তখনই ঠিকরে প্রতিফলিত হয়। যতটা আলোক একটা জিনিষের ওপর পড়ে তার সবটাই প্রতিফলিত হয় না। এর কতক অংশ ঐ জিনিষ নিজের মধ্যে শোষণ করে একেবারে আত্মসাৎ করে ফেলে, আর বাকী অংশের প্রতিফলন হয়ে থাকে। এ হচ্ছে জিনিষের স্বভাব বা ধর্ম। কথাটা এইখানে আরও একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে না বললে তোমরা হয়ত বুঝবে না।

পূর্বে “আলোক চিকিৎসা” প্রবন্ধে তোমাদের বলেছি যে, লাল কাঁচের ভেতর দিয়ে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করলে, আলোকের বর্ণচ্ছটার লাল ভিন্ন অপর রশ্মিগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কেন এমন হয়, সে কথাটা এখনও তোমাদের বলা হয় নি। অতি সহজ পরীক্ষা থেকেই ব্যাপারটা তোমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারবে। তোমরা সূর্যের আলোকের বর্ণচ্ছত্র থেকে প্রিজম (Prism) বা আতস কাঁচের সাহায্যে লালবর্ণের রশ্মিটাকে বিশ্লেষণ করে নিয়ে, যদি কোন লাল বর্ণের জিনিষের ওপরে ফেলতে পার, তবে দেখবে যে, ঐ জিনিষটির বর্ণ আরও উজ্জ্বল লাল হয়ে উঠেছে—মনে হবে যেন হঠাৎ লাল বর্ণটা বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। লাল রশ্মি লালবর্ণের জিনিষের ওপর ফেলায়

আকাশ কেন নীল ?

বর্ণটা কেন এত বৃদ্ধি পেয়ে গেলো তোমরা হয়ত তা বুঝতে পার নি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যে-জিনিষের বর্ণ লাল তার ওপর যখন সূর্যের রশ্মি পড়ে, তখন সেই জিনিষটি সূর্য-রশ্মির বর্ণচ্ছটা থেকে লাল ভিন্ন অপর সমস্ত বর্ণের রশ্মিকেই শোষণ করে নিজের ভেতরে গ্রহণ করে নেয়। আর লাল বর্ণের রশ্মিটা ঐ জিনিষে বাধা পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে প্রতিফলিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের দৃষ্টিকেও রাঙিয়ে লাল করে তোলে। এই কারণেই আমরা সে জিনিষটির বর্ণ লাল দেখে থাকি।

লালবর্ণের কোন জিনিষের ওপর লালবর্ণের রশ্মি পড়লে ঐ জিনিষ তা শোষণ করতে পারে না। সুতরাং ঐ রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ঐ জিনিষটি আমাদের চোখে আরও উজ্জ্বল লাল হয়ে ওঠে। যে জিনিষে বর্ণচ্ছত্রের লাল রশ্মি প্রতিফলিত হয় তাকে আমরা দেখি লাল, আর যে জিনিষে সবুজ বর্ণের রশ্মি প্রতিফলিত হয় তাকে দেখি সবুজ, এমনি কমলা, নীল, হলুদে প্রভৃতি সবার বেলায়ই এই একই নিয়ম। তা হলে দেখা যাচ্ছে কোন জিনিষেরই কোন সত্যিকার বর্ণ নেই। সবই হচ্ছে সূর্যের আলোকের কারসাজী এবং জিনিষগুলোর প্রতিফলন করবার বিভিন্ন প্রকৃতি বা স্বভাবমাত্র।

আকাশ কেন নীল ?

আমার এ কথাগুলো শুনে তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবছো, তা হ'লে আকাশের বর্ণ নীল কেন ? আকাশ ত আর সত্যি সত্যি কোন জিনিষ নয়। আকাশ যে কোন জিনিষ নয়, একথা অতি সত্যি। কিন্তু একটা কথা— আকাশ নিজে কোন জিনিষ না হলেও এতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের অস্তিত্ব আছে এবং বৈজ্ঞানিকেরা এর প্রমাণও পেয়েছেন। আকাশের সর্বত্রই সকল সময় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা ভেসে বেড়াচ্ছে। আকাশ কখনও ধূলির এই অণুপরমাণু থেকে মুক্ত থাকে না। পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা আকাশের অতি উঁচু জায়গায়ও ধূলিকণার অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন।

তোমাদের পূর্বেই বলেছি ইথারের ছোট বড় বিভিন্ন প্রকার চেউয়ে বিভিন্ন প্রকার রশ্মির জন্ম হয়। সূর্যের আলোকের বর্ণচ্ছত্রের লাল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি রশ্মিগুলো জন্মে ইথারের বড় বড় চেউ থেকে। এই বড় চেউগুলো সাধারণ ভাবে চলবার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুপরমাণুতে কোনরকম বাধা পায় না। সেগুলো অতিক্রম করে অনায়াসে চলে যায়। বাধা পায় শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেউয়ে যে সব রশ্মির জন্ম—সেগুলো। এর মধ্যে নীলবর্ণের রশ্মি অগ্রগতম। অণুপরমাণুর মধ্যস্থিত বিদ্যুতিনে বাধা পেয়েই

আকাশ কেন নীল ?

নীলবর্ণের রশ্মিটা বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয় এবং চারদিকে ঐ নীল বর্ণ বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আকাশকে একেবারে নীলে নীলে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সময় সময় আবার আকাশের গায় অশ্রু রংও দেখা যায়। পৃথিবীর চারদিকেই বাতাসের একটা আবরণ রয়েছে আর আকাশও সব সময়েই ধূলির কণায় পরিপূর্ণ থাকে। সূর্যের আলোক সব সময়েই এই বাতাসের স্তর ও ধূলির কণা ভেদ করে পৃথিবীতে নেমে আসে। কখন সূর্যের আলোককে সব চেয়ে বেশি বাতাসের স্তর ও ধূলির কণা ভেদ করে আসতে হয় বলতে পার ? সকাল ও বৈকাল বেলা। সে সময় সূর্য পূর্বে ও পশ্চিমে টেরুচা ভাবে হেলান থাকে। সব চেয়ে কম বাতাস ও ধূলির স্তর ভেদ করে সূর্যের আলো কখন আসে ? যখন সূর্য একেবারে সোজাসুজিভাবে আমাদের মাথার ওপরে থাকে অর্থাৎ দুপুর বেলা। সুতরাং সূর্যের আলো চলার পথে সব চেয়ে বেশি বাধা পায় সকাল ও বৈকাল বেলা আর সব চেয়ে কম বাধা পায় দুপুর বেলা। সকাল ও বৈকাল বেলা বেশি পথ অতিক্রম করতে গিয়ে আলোক রশ্মির ছোট ছোট টেউগুলো আকাশে অবস্থিত অনুপরিমাণগুলোতে এমনই শক্ত বাধা পায় যে,

আকাশ কেন নীল ?

সেগুলো প্রতিফলিত হয়েও আর নীচে নামতে পারে না। কেবল আলোক-রশ্মির বড় বড় ঢেউগুলো, যেমন লাল, হলুদে, সবুজ প্রভৃতি, প্রতিফলিত হয়ে সব বাধা অতিক্রম করে নীচে নেমে আসে। তাই ছপুর বেলাকার আকাশই দেখায় সব চেয়ে বেশি নীল আর সকাল ও বৈকাল বেলা আকাশের গায় বর্ণচ্ছটার নানা বর্ণের চমৎকার খেলা দেখতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেক্ট রামন্ একদা বিলেত থেকে জাহাজে ভারতবর্ষে ফেরবার পথে ভূমধ্যসাগরের মাঝে এসে, আকাশের দিকে তাকিয়ে সেখানে নীল বর্ণের অদ্ভুত প্রাচুর্য লক্ষ্য করে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান। প্রকৃতির এই অদ্ভুত রহস্য তাঁর মনে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এর সত্যিকার কি কারণ—তাই জানবার জন্ম তিনি বিশেষভাবে উদ্ভিন্ন হয়ে পড়েন।

এইখানে এর গোড়ার কথা একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড র্যালো আকাশের বর্ণ কেন নীল—সর্বপ্রথম এর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন। টিঙেল নামে অপর একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা লর্ড র্যালোর ঐ ব্যাখ্যা প্রমাণ করে দেন। লর্ড র্যালো

আকাশ কেন নীল ?

দেখিয়েছিলেন যে, আকাশে সব সময় যে ধূলিকণা উড়ে বেড়ায় তাতে আলোক তরঙ্গ বাধা পেয়েই এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক রহস্যের সৃষ্টি করে। এই বিষয়ের গবেষণা সম্পূর্ণ করবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। তার পর তাঁর পুত্র পিতার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করেন।

কলিকাতায় ফিরে এসে রামন্ এই সব গবেষণার সূত্র অবলম্বন করে এ বিষয়ে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। বহু বৎসরের সাধনা ও গবেষণার ফলে রামন্ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বসে “আকাশের বর্ণ কেন নীল” —এর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে সমর্থ হ’ন। আকাশে যে সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহ বিদ্যমান তাতে আলোকের বর্ণচ্ছটার রশ্মিবেশেষের প্রতিফলনের ফলে আলোক রশ্মির একত্রীভূত বিচ্ছুরণ হয় এবং সেই কারণেই আকাশের বর্ণ নীল দেখায়। এটাই তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করে দেন। প্রিংস্‌হাইম প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতগণও পরীক্ষা দ্বারা রামনের এই আশ্চর্য আবিষ্কার প্রমাণ করেছেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঐ বৎসরটা বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯২৮ সালের ঘটনা এটা। “আলোক-রশ্মির বিচ্ছুরণ” বিষয়ে তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে সে সময় বিজ্ঞান-জগতে একটা হুলস্থূল পড়ে যায়। এ সম্বন্ধে তিনি

আকাশ কেন নীল ?

যে সব নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন, তার ফলে বৈজ্ঞানিকদের বহু প্রাচীন বিশ্বাস ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাঁরই নাম অনুসরণ করে তাঁর আবিষ্কারের নামকরণ করা হয়েছে “রামন্ এফেক্ট” বা “রামন্ রশ্মি”। রামন্ এই আশ্চর্য আবিষ্কার করে, বিজ্ঞান জগতে আমাদের দেশের সম্মান যে কতখানি বৃদ্ধি করেছেন তা আর বলে শেষ করা যায় না। এর জীবন-কথা সংক্ষেপে কতকটা বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করবো।

মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় এঁদের পিতৃ-পুরুষের আদি নিবাস। এঁদের বংশ অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশ। এ বংশে সংস্কৃত-সাহিত্য, ভারতীয় দর্শন প্রভৃতির বহু খ্যাতনামা গণ্ডিত জন্মেছেন। এঁদের পরিবারের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহাও বরাবরই খুব বেশী। একদা রামনের পিতৃব্য মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলা থেকে সুদূর বঙ্গদেশের নবদ্বীপে শ্রায়দর্শন পড়বার জন্ত এসেছিলেন। জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা খুব বলবতী না হলে পথের অসংখ্য কেশ সহ করে কি কেউ এত দূর আসে। আজকালকার মত সহজে যাতায়াত করবার জন্ত তখন রেলগাড়ী ত আর ছিল না। সুতরাং পায়ে হেঁটেই তাঁকে আসতে হয়েছিল। একবার ভেবে দেখ ত কি কঠিন ব্যাপারখানা! রামনের

আকাশ কেন নীল ?

বাবা অন্ধদেশের ভিজিয়ানাগ্রামে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সেখানেই তাঁর জন্ম হয়।

প্রতিভাবান পুরুষের প্রতিভার বিকাশ বাল্যকালেই হয়ে থাকে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, সম্মানলাভ করতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বহু পুরস্কার এবং বৃত্তিও পেয়েছেন। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন তিনি এম্. এম্-সি পড়ছিলেন, সে সময়েই পদার্থ বিজ্ঞানের এমন চমৎকার একটা মৌলিক আবিষ্কার করেন, যে, তা দেখে সেখানকার ঐ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক দিষ্টার জোন্স একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান। পদার্থ বিজ্ঞানে রামনের এই অদ্ভুত মেধার পরিচয় পেয়ে, এম্. এম্-সি পাশ করার পর অধ্যাপক জোন্স তাঁকে শিক্ষা-বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন কারণে রামন্ তাতে স্বীকৃত হতে পারেন নি।

তিনি এম্. এম্-সি পাশ করে, মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ভারত সরকারের ফাইনাল বিভাগের চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিলেন এবং সম্মানে

আকাশ কেন নীল ?

উত্তীর্ণ হয়ে ডেপুটী একাউন্টেন্ট জেনারেলের পদ লাভ করলেন। এই চাকুরীতে যেমন দায়িত্ব তেমনি এর মাইনেও বড় কম নয়। প্রায় পাঁচশো টাকা থেকে এই চাকুরী শুরু করতে হয় এবং ক্রমে তা' বৃদ্ধি পেয়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপে সরকারী দপ্তরে বসে ভারত সরকারের লাভ লোকসানের হিসাব কষতে কষতে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায় শুরু করেন।

সরকারী দপ্তরের হিসাব-নিকাশ ও লাভ-লোকসানের নীরস আবহাওয়ার মধ্যে পড়েও রামনের অফুরন্ত কৰ্ম-প্রেরণা শুকিয়ে যায় নি। দায়িত্বপূর্ণ কঠোর কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই তিনি অবসর পেতেন তখনই পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চায় মনোনিবেশ করতেন। এইভাবে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা করে কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কার করেন। এবং এইসব আবিষ্কারের কথা ইয়োরোপীয় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। মাসের পর মাস বিভিন্ন পত্রিকায় এই রকম সব প্রবন্ধ প্রকাশ করে, তিনি সবাইকে অবাক করে দিতে লাগলেন। সকলেই আশ্চর্য হয়ে মনে মনে ভাবতো, এরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে, সমস্ত দিন দারুণ

আকাশ কেন নীল ?

পরিশ্রম করবার পর, বিজ্ঞানের গবেষণা করবার মত এমন কঠিন কাজের জন্য তিনি কখন সময় পান ?

এরপর সহসা রামনের ভাগ্যচক্র অন্য পথে পরিচালিত হয়ে পড়লো। ১৯১২ সালে রামন্ কলিকাতায় বদলী হয়ে এলেন। এখানে এসেই তাঁর প্রতিভা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলো। রামন্ আজ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলে, যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, কলিকাতায় না এলে হয়ত বা তার ভাগ্য তা লাভ করা ঘটে উঠতো না। হয়ত বা সরকারী হিসাব-বিভাগের কাগজ পত্র ঘেঁটে ঘেঁটেই তাঁর কর্মজীবনের অবসান হতো। এখানে এসে বিজ্ঞানের চর্চা করবার তাঁর মস্তবড় একটা সুযোগ মিলে গেলো।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতবাসীরা বিজ্ঞান অনুশীলন করবার যাতে সুযোগ পেতে পারে, এই উদ্দেশ্যে একটা পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদের জন্য তিনি একটা গবেষণাগারও স্থাপন করেন এবং সেখানে বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আমদানী করে একটা সম্পূর্ণ পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর আশা ছিল এই বিজ্ঞান-মন্দিরের তলে বসে গবেষণা করে ভারতবাসী বৈজ্ঞানিকেরা নূতন নূতন আবিষ্কারের

আকাশ কেন নীল ?

সাহায্যে দেশবাসীর ছঃসহ দারিদ্র্য ও ঘোর কুসংস্কার দূর করে দেশমাতৃকাকে নানাভাবে সম্পদশালিনী কবে তুলবে ।

কলিকাতায় এসে রামন্ এই বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণা-গারেই গবেষণা শুরু করলেন । যতক্ষণ অফিসের কাজ থাকতো, ততক্ষণ সেখানে কাজ করতেন, আর বাকী সময় গবেষণাগারেই কাটাতেন ।

এই সময়ে কলিকাতার দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী, স্মার রাসবিহারী ঘোষ ও স্মার তারকনাথ পালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগকে সুগঠিত করে তোলবার জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করেন । এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন স্বর্গীয় স্মার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে যোগ্য অধ্যাপক নিয়োগ করবার ব্যাপার নিয়ে তিনি মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন । কারণ তখনও ভারতবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা তেমন প্রসার লাভ করে নাট । এই সমস্ত কাজে ভারতবাসী নিয়োগ করাই প্রত্যেকের উদ্দেশ্য । স্মার আশুতোষ পূর্বেই রামনের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন । তিনি মনে মনে ভাবলেন, রামনের মত একজন প্রতিভাশালী তরুণ বৈজ্ঞানিককে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করতে পারলে সব দিক দিয়েই ভাল হয় ।

আকাশ কেন নীল ?

কিছু সমস্যা ছিল—এত মাইনের একটা সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কি করে তাঁকে তিনি অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন। তবুও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে আহ্বান করলেন। আশুতোষ বুঝেছিলেন যে, রামনের মত প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক এ কাজে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারবেন। বিজ্ঞানের প্রতি রামনের বরাবরই একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। সুতরাং তিনি আশুতোষের আহ্বান কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারলেন না। অনেকে তাঁকে সরকারী চাকুরী ছেড়ে একাজে যোগদান করতে নিষেধ করলেন কিন্তু তিনি কারো কথাই শুনলেন না। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত-অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

তখন থেকে তিনি নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞানের সেবায় মনোনিবেশ করলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার তাঁর কাছে যেন নিজ গৃহের মতো হয়ে উঠলো। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত থেকে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার করে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলতে লাগলেন।

আকাশ কেন নীল ?

কর্শ্ব, কর্শ্ব, কর্শ্বই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। এই কর্শ্বদ্বারাই আজ বিজ্ঞান-জগতে তিনি একটা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। ১৯২৮ সালে বিজ্ঞান-জগতে তাঁর খ্যাতি খুব বেশিভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ই তিনি “আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ” সম্বন্ধে অভিনব আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে তোমাদের পূর্বে বলেছি। ১৯৩০ সালে রামন্ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বর্তমানে অবশ্য তিনি আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেই। জীবনের চরম খ্যাতি এখান থেকে অর্জন করে, আজ তিনি তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি বর্তমানে বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-পরিষদের পরিচালকরূপে কাজ করছেন। সে কাজেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর বয়স এখন মাত্র পঞ্চাশ। এখনও তাঁর যথেষ্ট কর্শ্ব-শক্তি রয়েছে। আশা করা যায় বিজ্ঞান-জগতে তিনি আরও অনেক নূতন দান করতে পারবেন।*

* আচার্য্য মেদনাদ সাহার ইংরেজী ভাষায় লেখা একটা প্রবন্ধ থেকে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

টেলিভিসন

(বেতারে ছবি পাঠানো)

কোয়েটায় ভূমিকম্প হয়ে সমস্তটা শহর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেলো—বালিনের মাঠে ভারতীয় দলের সঙ্গে জারমান দলের হকি খেলা,—লণ্ডনে পার্লামেন্টের বক্তৃতা—এসবের যদি অবিকল চিত্র তোমরা মুহূর্তের মধ্যে ঘরে বসে দেখতে পাও—তা হ'লে কি একেবারে অবাক হয়ে যাও না !

কথাটা শুনে অবধি তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবছো এ-ও কি সম্ভব ! হ্যাঁ, এ-ও সম্ভব । দূর দূরান্তরের জিনিষ যাতে অতি সহজে ঘরে বসেই দেখা যেতে পারে তার উপায় বার করবার চেষ্টা মানুষ বহুকাল থেকেই করে আসছে । বিশেষ করে যে সব দূরের জিনিষ চোখের সাহায্যে দেখা সম্ভব নয় । এরই ফলে একদিন গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন দূরবীক্ষণ যন্ত্র । তারপর যখন মানুষ বিদ্যুতের শক্তি ব্যবহার করতে শিখলো তখন নানাভাবে মানুষ এর আরও উন্নতি নানারকমে করতে শুরু করলো । ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এব্.বি ক্যাসেলি নামে একজন বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তারের ভেতর দিয়ে নক্সা, ম্যাপ ইত্যাদি দূরে পাঠাবার একটা উপায় বার করেন । ক্রমে নানাভাবে নানারকমে এর উন্নতি করেন ।

টেলিভিসন

ইংরিজী ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিনাতারে ছবি পাঠাবার কৌশল কেউই জানতো না। তখনই এ সম্বন্ধে আবিষ্কারের একটা সূচনা হয়। বিনাতারে ছবি পাঠাবার কথা শুনে তোমরা হয়ত সত্যি সত্যি একটু অবাকই হচ্ছ। কিন্তু এতে অবাক হ'বার কিছুই নেই—কারণ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে আজ বহু অসম্ভব জিনিষ যেমন সম্ভবে পরিণত হয়েছে—তেমনি এ ব্যাপারটাও সম্ভব হয়েছে।

বিনাতারে যে টেলিগ্রাম পাঠানো যায় এ খবরটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আজ আর অজানা নেই। এ কথাটা এখন আর কারো কাছে তেমন কিছু আশ্চর্য বলেও বোধ হয় হয় না। বিনাতারে শুধু টেলিগ্রামই নয়—টেলিফোন—এমন কি বক্তৃতা, নাচ-গান, নাটক সব কিছুই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অতি অনায়াসেই পাঠানো চলে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বা টোকিওতে বসে একজন বক্তৃতা করলে বা গান গাঠিলে, কলিকাতায় বসে তা আর একজন অনায়াসে উপভোগ করতে পারে। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই আশ্চর্য কাণ্ড সাধিত হয়ে থাকে তাকে বলে রেডিও। রেডিও আজকাল সর্বত্রই দেখা যায়। আজকাল রেডিওর গ্রাহক-বহুর দামও এত সস্তা হয়েছে যে, সাধারণ গৃহস্থেরাও ইচ্ছা করলে এর একটা কিনে নিতে পারে। পৃথিবীর প্রত্যেক

টেলিভিসন

সুসভ্য দেশেই নিয়মিত ভাবে গান, বক্তৃতা, নাটক, সংবাদ প্রভৃতি বেতারে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং একটা গ্রাহক-যন্ত্র থাকলে ঘরে বসে ঐ সব শুনে বেশ আনন্দ উপভোগ করা চলে।

বক্তৃতা, গান ইত্যাদি যে উপায়ে একদেশ থেকে আর এক দেশে পাঠানো যায়—ছবি পাঠাবার সময়ও সেই কৌশলই বহুল পরিমাণে অবলম্বন করা হয়। পার্থক্য শুধু যন্ত্রের মধ্যে। তোমাদের কাছে “আলোক-চিকিৎসা” গল্পে আমাদের চতুর্দিক যে ইথারে পূর্ণ সে কথা বলেছি। ইথারের নানারকম চেউয়ে যে নানারকম কাণ্ড ঘটে থাকে, সে কথাও তোমরা ঐ গল্পেই শুনেছো। এই ইথারের মধ্যে আর এক রকম চেউয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে—সে কথা তোমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে ঐ গল্পে বলিনি। এই চেউয়ের নাম বৈজ্ঞানিকেরা দিয়েছেন বেতারের চেউ (Wireless Waves)। এই চেউয়ের সাহায্যেই গান, বক্তৃতা ও ফটোগ্রাফ ইত্যাদি একদেশ থেকে আর একদেশে পাঠানো হয়। কথাটা এখানে একটু বুঝিয়ে বলছি। পুকুরের জলে যদি একটা তিল ছুঁড়ে ফেল—তা হলে কি হয়? পুকুরের যে জায়গায় গিয়ে তিলটি পড়ে, সেখানকার জল ছিটকে লাফিয়ে ওপরের দিকে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গেই চেউয়ের সৃষ্টি হয়। কেমন,

বিজ্ঞানের গল্প

১২২

টেলিভিসন

তাই নয় ' কি ? এবং সেই চেউ গোল আকারে ভাসতে ভাসতে ক্রমে পুকুরের পারে গিয়ে বাঁধা পায়। এবং ভেঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। এ ব্যাপারটা তোমরা অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে। আমাদের চতুর্দিকে যে ইথার-সমুদ্র রয়েছে তার মধ্যে যদি বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে আঘাত করা যায় তা হ'লে সেখানেও ঐ রকম চেউয়ের সৃষ্টি হয়—এবং সেই চেউগুলি গোল আকারে চারদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল নামে একজন পণ্ডিত প্রমাণ করেন যে, বিদ্যুতের সাহায্যে ইথার সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি করলে—সেই তরঙ্গ অতি দ্রুতবেগে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারে। গণিতের সাহায্যে এবং বিচারবুদ্ধিদ্বারা এই তত্ত্ব তিনি প্রমাণ করেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে, এই তরঙ্গকেই বেতারে বার্তা পাঠাবার বাহন রূপে ব্যবহার করা হয়। একেই বলে বেতারের চেউ (Wireless Waves)।

এর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত হেনেরিস্ হার্জ এই তত্ত্ব হাতে কলমে প্রমাণ করে দেন। তিনি এমনি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেন যার সাহায্যে ইথার সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি করা চলে। এর সাহায্যে শুধু



سید محمد



سید محمد

টেলিভিসন

তরঙ্গের সৃষ্টি করাই চলে না—ইথার সমুদ্রের মধ্যে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তা-ও বেশ বোঝা যায়। হাৎজের এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সবাই বুঝলে যে, ম্যাক্সওয়েলের আবিষ্কৃত তত্ত্ব শুধু মুখের কথা নয়—এ একেবারে খাঁটি সত্য। বেতারে বার্তা প্রেরণ করবার কৌশল আবিষ্কারের এইখানেই সূত্রপাত হলো।

বিদ্যুতের সাহায্যে ইথারের মধ্যে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, তা পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়লে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়—অনেকটা সেই রকম। কিন্তু পুকুরের জলের চেউ খুব বেশী দ্রুত চলতে পারে না। কিন্তু ইথার তরঙ্গের বেগ খুব বেশী। একথা পূর্বেই তোমাদের বলেছি। হাৎজের আবিষ্কৃত যন্ত্রের একটু খুঁৎ ছিল। এই যন্ত্রের সাহায্যে ইথার সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, দূরে বসে যদি সত্যি সত্যি সেখানে চেউ উঠেছে কি না তা পরীক্ষা করতে যাওয়া যায় তা হলে তা সম্ভব হয় না। সুতরাং হাৎজের আবিষ্কার এই দিক দিয়ে বিশেষ সফল হলো না।

এব পর সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক ব্রান্‌লী, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্মার অলিভার লজ, আর আমাদেরই বাংলা মায়ের কৃতী সম্ভান স্মার জগদীশচন্দ্র বসু, হাৎজের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে নানারকম পরীক্ষা শুরু করলেন। ইথার সমুদ্রে

টেলিভিসন

তরঙ্গের সৃষ্টি করলে, দূরে বসে কি ভাবে তা বোঝা যেতে পারে তারই উপায় উদ্ভাবন করবার জন্ম তাঁরা চেষ্টি আরম্ভ করলেন। এবং তাঁরা কৃতকার্যও হলেন। তাঁরা ঐ কাজের উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কারও করতে সক্ষম হলেন। এই যন্ত্রকে বলে কোহেরার (Coherer) বা সংযোজক যন্ত্র। এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলেই ইথার তরঙ্গের সাহায্যে বার্তা প্রেরণের কাজ অনেকটা এগিয়ে এলো।

এই সমস্ত আবিষ্কারের সূত্র অবলম্বন করে সিগ্নর মারকনি নামে একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে গিয়ে, ইথার তরঙ্গের অদ্ভুত শক্তির কথা প্রথম অবগত হন। তিনি একে কি করে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায় তার উপায় উদ্ভাবন করবার জন্ম গবেষণা আরম্ভ করেন। পরীক্ষা করে, তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইথারের মধ্যে চেউয়ের সৃষ্টি করে, ইচ্ছা করলে তারই সাহায্যে সংবাদ পর্য্যন্ত প্রেরণ করা সম্ভব হতে পারে। তিনি এই কথা ভেবেই—একটা নূতন আবিষ্কারের আশায় মত্ত হয়ে উঠলেন। পরীক্ষা করতে করতে মারকনি বুঝলেন যে, তাঁর পূর্বে যে সমস্ত আবিষ্কার হয়েছে, সে কৌশলে ইথার তরঙ্গ খুব বেশী দূরে পাঠানো সম্ভব নয়। এরই মধ্যে আর একটা আবিষ্কার হওয়ায় মারকনির কাজ অনেকটা সহজ হয়ে

টেলিভিসন

এলো। সুপ্রসিদ্ধ রাশিয়ান পদার্থবিদ্যাবিদ পণ্ডিত পপ্তভও এইসব বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। তিনি একটা উঁচু মাস্তুলের সাহায্যে ইথার সমুদ্রে বিদ্যুৎ-ফুলিংয়ের আঘাত করে, তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাকে দূরে প্রেরণ ও গ্রহণ করবার কৌশল আবিষ্কার করেন। এই উপায়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তিন মাইল দূরে সঙ্কেত প্রেরণ ও গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে মারকনি এর অনেক উন্নতি করে, প্রায় আঠার মাইল দূরে সঙ্কেত প্রেরণ ও গ্রহণ করেন।

আজকাল যত সহজে এই যন্ত্রের সাহায্যে বক্তৃতা, গান ইত্যাদি এক জায়গা থেকে পাঠানো যায় ও আর এক জায়গায় বসে গ্রহণ করা চলে, প্রথম অবস্থায় এই যন্ত্রের সাহায্যে এত সহজে তা সম্ভব হতো না। এই যন্ত্রকে বর্তমান অবস্থার মত কার্যকরী করে তুলতে বহু বৈজ্ঞানিক বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তারই ফলে আজ মানুষ এক জায়গায় বসে দূরদূরান্তরের কথা, গান, বক্তৃতা ইত্যাদি অতি অনায়াসে শুনতে পারছে।

যে যন্ত্রের সাহায্যে কথাবার্তা এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় পাঠানো হয়, তাকে বলে প্রেরক-যন্ত্র (Transmitter) আর যে যন্ত্রের সাহায্যে কথাবার্তা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে গ্রাহক-যন্ত্র (Receiver)। প্রেরক-যন্ত্রের একটা

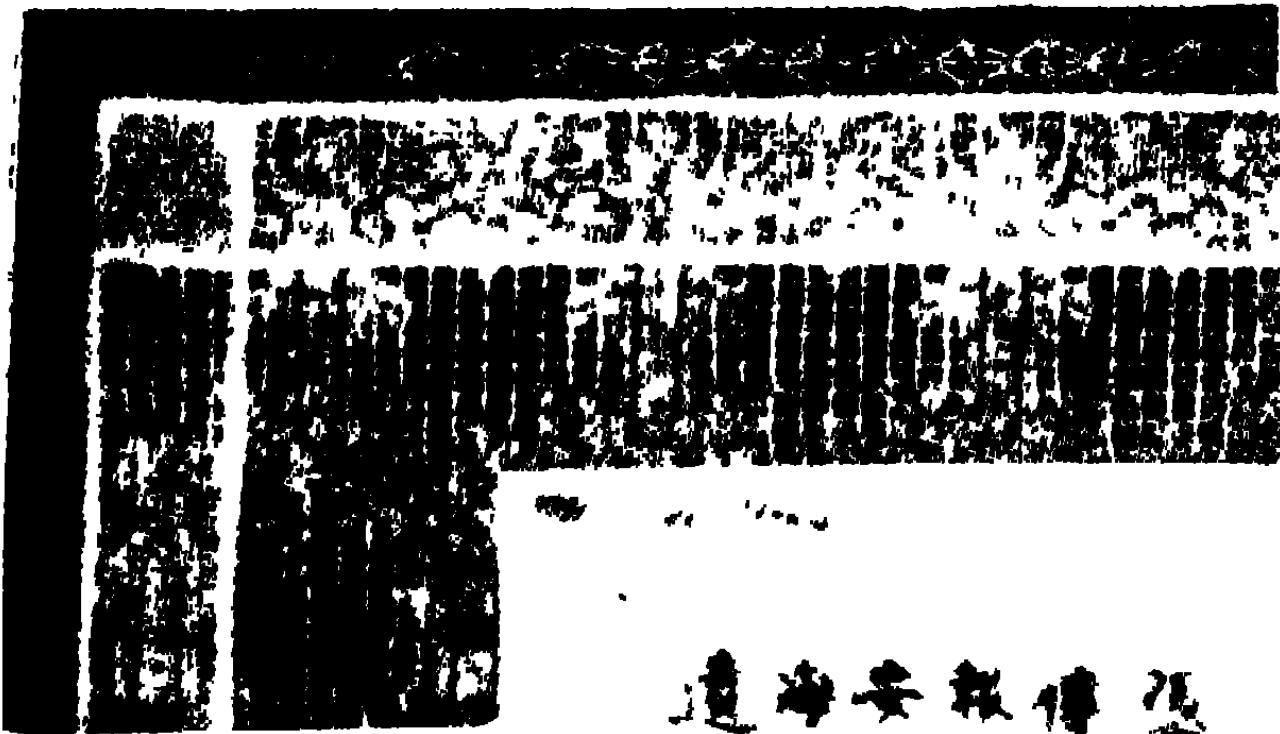
টেলিভিসন

অংশকে বলে মাইক্রোফোন (Microphone)। এরই সামনে মুখ রেখে কথা বলা হয়। এই যন্ত্রের সামনে মুখ রেখে কথা বলা মাত্র শক্তিশালী বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে ইথার সমুদ্রে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, ঐ শব্দকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঐ শব্দ ঢেউকে অবলম্বন করে দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। যেখানে শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র আছে সেখানে গিয়ে এই ইথার তরঙ্গ আঘাত করে। এবং যারা সেখানে থাকে তারা ঐ শব্দ শুনতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু সব কথা তোমাদের পক্ষে এখন বোঝা সম্ভব হবে না বলেই তা থেকে বিরত হ'লাম। তোমরা বড় হয়ে বিষয়গুলি পড়ে দেখো, ভারী আমোদ পাবে।

বিনাতারে যেমন সংবাদ, বক্তৃতা, গান ইত্যাদি পাঠানো চলে তেমনি বিনাতারে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় কোন দৃশ্য বা মানুষের চিত্রও পাঠানো যেতে পারে। এই যন্ত্রেরও আজকাল খুবই উন্নতি হয়েছে। শুধু একটা মানুষের চিত্রই যে এ যন্ত্রের সাহায্যে পাঠানো চলে তা নয়। ইচ্ছা করলে, একটা সম্পূর্ণ নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, বা একটা ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচ বা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ছবি বা ঐ রকম আরও কিছুর ছবির প্রতিলিপি বেতারে একদেশ থেকে অপর দেশে পাঠানো যায়।



বান্দার হাট, পিলাসদার জল
স্রোত ও লেখার রেডিও ফাট



遠海安報博憑
客外 平語 畫

চীনা কক্ষের রেডিও ফটো

(বামে—উপরে) ভাঙ্গা আড়ের 'গ্যারে' ফটোর রেডিও
ফটো : (বামে—মাঝে) আঙ্গুল-ছাপের রেডিও ফটো।
(বামে—নীচে) বান্দার লেসের (lace) নমুনার
রেডিও ফটো পাঠিয়েছেন।



টি পক্ষের জঙ্গ সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন।

টেলিভিসন

আজকাল আরও সুবিধা করা হয়েছে—ইচ্ছা করলে কথাবার্তাও সেই ফটোর সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া চলে। ধর, লণ্ডনে আলহামরা থিয়েটার হলে একটা নাটক হচ্ছে—সেই নাটক তোমরা কলিকাতায় বসে ইচ্ছা করলে পর্দার গায় প্রতিফলিত দেখতে পার এবং সঙ্গে সঙ্গে গান, অভিনয় সবই শুনতে পার। ঠিক যেমন তোমরা চলচ্চিত্রে সবাক ছবি দেখতে পাও। এ যন্ত্রেরও ক্রমেই এতটা উন্নতি হচ্ছে যে—আশা করা যায় এই যন্ত্রের সাহায্যে একদিন এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের যে দূরত্বের ব্যবধান আছে তা আর থাকবে না।

কি করে বেতারে চিত্র পাঠাতে হয় সে কথা জানবার জন্য তোমাদের হয়ত খুবই কৌতূহল হচ্ছে। সেই সম্বন্ধেই সংক্ষেপে তোমাদের বলছি; কারণ বিষয়টা অত্যন্ত জটিল বলে, তোমরা সব কথা এ বয়সে হয়ত বুঝবে না। চলচ্চিত্রে কি করে চলন্ত ছবি দেখানো হয় তা তোমরা হয়ত জানো না। ধর, যেমন চলচ্চিত্রে দেখানো হবে একজন মানুষ একটা গাড়ীতে উঠছে। এ অবস্থার চিত্র দেখাতে হলে, এই গাড়ীতে ওঠবার বিভিন্ন অবস্থার অনেকগুলো ফটোগ্রাফ তোলা হয়। এই একটা সামান্য ব্যাপারেরই হয়ত কুড়ি পঁচিশটা ছবি তুলে নেওয়া হলো। এক এক অবস্থার এক একটা।

টেলিভিসন

লোকটী একটু এগিয়ে গেলো, তারপর গাড়ীর দরজা খুললো, তারপর গাড়ীর পাদানির ওপরে পা রাখলো, তারপর ভেতরে ঢুকলো, তারপর বসলো—এই রকম সব। এই বিভিন্ন অবস্থার ছবিগুলো তুলে নিয়ে, একটা যন্ত্র-শক্তি বলে খুব জোরে জোরে ঘুরিয়ে যদি আলোকের সাহায্যে ছবিগুলোকে পর্দার গায়ে প্রতিফলিত করা যায়, ও সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে মনে হবে যেন আমরা একটা মানুষকে একেবারে গাড়ীতেই উঠতে দেখছি। ঐ ভাবে বিভিন্ন অবস্থার ছবিগুলো ভিন্ন ভিন্ন আর আমরা দেখতে পাই না। কারণ একটার পর আর একটা চিত্র ছুটে এসে আমাদের চোখে একেবারে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। আচ্ছা, আরও একটু সহজ করে বলি, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে যদি খুব জোরে গোল আকারে ঘোরাও তা হলে কি মনে হয়? মনে হয় না কি যে, একটা গোল আঙুনের রেখা দেখা যাচ্ছে। এইভাবেই আমাদের চোখ একটা সম্পূর্ণ ঘটনাকে গ্রহণ করে থাকে। গতি আছে বলে আমাদের চোখ এর বিভিন্ন অংশ পৃথক পৃথক করে আর দেখতে পায় না—দেখে একেবারে সম্পূর্ণ ঘটনাটা। চলচ্চিত্রও এই নিয়মেই চলে।

টেলিভিসন

বেতारे चित्र प्रेरण करवार कौशल आविष्कार करवार पूर्वे এই रकम एकटा कथाई मानुषेर मने प्रथम साङ्गा जागिये तुलेछिल । मानुष भावले, 'एकटा दृश्येर छवि पाठाते हले, एके छोट छोट करे विभिन्न अंशे विभक्त करे ना निये, सम्पूर्ण दृश्य एक सङ्गे पाठानो संभव हवे ना । এই कथा भेवेई मानुष एर कौशल आविष्कारेर चेष्टाय मनोनिवेश करलो । सुप्रसिद्ध स्कच् वैज्ञानिक जे. एल. बेयार्ड ए सङ्के गबेष्णा करे करे एर एकटा पन्हाओ आविष्कार करलेन ।

तिनि बार करलेन एकटा दृश्येके यदि कोन क्रमे अति सूद्र सूद्र अंशे विभक्त करे, ताके विद्याते परिणत करे नेओया याय, ता हले बेतारेर टेउयेर साहायो এই विद्यातेके अनायासे एकदेश थेके अपर देशे पाठानो चले । এই काजेर जग्य एकटा यन्त्रओ तिनि तैरौ करे फेल्लेन । अवश्य आजकाल ए यन्त्रेर यतटा उन्नति हयेछे प्रथम अवस्थाय ए यन्त्र ततटा उन्नत छिल ना । आजकाल ये रकम यन्त्रेर साहायो चित्र पाठानो हय से यन्त्रेर कथाई तोमादेर बल्बो, कारण प्रथम दिककार यन्त्रेर कथा बले लाभओ नेई—आर किरूपे ए यन्त्रेर नानाभावे उन्नति करा

টেলিভিসন

হয়েছে সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা চলবেও না—কারণ বিষয়টা ভারী শক্ত ।

কথাবার্তা পাঠাতে হলে প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সামনে মুখ রেখে যেমন কথা বলতে হয় তেমনি যে মানুষের বা দৃশ্যের চিত্র বেতারে পাঠাতে হবে—তা'দিগেও ঐ রকম একটা যন্ত্রের অতি সামনে নিয়ে রাখতে হয় । তারপর বেতারে পাঠাবার মানুষ বা দৃশ্যকে এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে নিয়ে বিদ্যুতানুতে পরিণত করে, বেতারের টেউয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় । এলুমিনিয়ম ধাতুর নির্মিত কুড়ি ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট একটা চাকা এই কাজের জন্য আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে । এই চাকাতে ত্রিশটি ছোট ছোট চতুষ্কোণ ফুটো আছে । প্রত্যেকটি ফুটোর প্রত্যেকটি পাশ এক ইঞ্চির ত্রিশ ভাগের একভাগ লম্বা । এই ফুটোগুলো চাকাটির পরিধি বেষ্টন করে গোলাকারে সাজানো । যে দিক থেকে বেতারে দৃশ্য পাঠানো হয়, সেদিকে খুব তীব্র উজ্জ্বল একটা আলোক রাখা হয় । এই আলোকটি অনেকটা ম্যাজিক ল্যাটার্ণেরই মত । এই আলোকের সামনেই থাকে ঐ এলুমিনিয়মের চাকাটি । এই চাকার পেছনে আবার একটা আরশী জাতীয় বড় একখণ্ড কাচ রাখা হয় । এর উদ্দেশ্য চাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ

বিজ্ঞানের গল্প

টেলিভিসন

ছিত্রের ভেতর দিয়ে যে আলো বেরিয়ে আসবে তাকে কেন্দ্রীভূত করে নেওয়া। যে মানুষ বা দৃশ্যের ছবি বেতানে পাঠাতে হবে তা থাকে এরই পেছনে। এই চাকার ফুটো-গুলো আবার বেশ একটু কৌশল করে সাজানো। চাকাটির পরিধি বেঁটন করে এগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে, যে একটা ফুটো আর একটা ফুটোর চেয়ে চাকার কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্তী। এই চাকাটি অতি দ্রুতগতিতে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে ঘোরাণ হয়। চাকাটি মিনিটে প্রায় সাত শত পঞ্চাশ বার ঘোরে। এর ফলে ঐ তীব্র উজ্জ্বল আলোক বিন্দু বিন্দু করে চাকার ফুটোগুলোর ভেতর দিয়ে গিয়ে আরশীতে কেন্দ্রীভূত হয়ে, বেতানে যে মানুষ বা দৃশ্যের চিত্র পাঠানো হবে, তারই ওপরে পড়ে প্রতিফলিত হয় এবং সম্মুখে অবস্থিত আর একটা যন্ত্রের ওপরে গিয়ে পড়ে। এই যন্ত্রটিকে বলে ফটো ইলেকট্রিক সেল (Photo Electric Cell)। এই যন্ত্রটিও খুবই আশ্চর্য্য। এ যন্ত্রের বিষয়ও সব কথা তোমরা বুঝবে না। তবে সংক্ষেপে বলছি এই থেকেই বুঝে নিও। এই যন্ত্রের মধ্যে যখন প্রতিফলিত আলোক-রেখা বিন্দু বিন্দু করে পড়তে থাকে তখনই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে পড়ে। আলোকবিন্দু পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ যন্ত্রের

টেলিভিসন

মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই যন্ত্রের মধ্যে কি করে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা বলছি। প্রত্যেক ধাতুর ধর্মই হচ্ছে এই, যে, যদি তার ওপরে আলো পড়ে তা হ'লে তা থেকে সামান্য পরিমাণ বিদ্যুতানু ছুটে বেরোয়। বিদ্যুতানু কাকে বলে সে কথা রেডিয়মের গল্পে তোমাদের কাছে বলেছি। পটাসিয়ম ও সোডিয়ম প্রভৃতি ধাতুর ওপরে আলোক পড়লে তা থেকে বিদ্যুতানু একেবারে স্রোতের আকারে বইতে থাকে। ফটো ইলেকট্রিক সেলের মধ্যেও এই রকম একটা ধাতু থাকে। এই রকম যন্ত্রের ওপরে আলোক পড়বামাত্র তা থেকে বিদ্যুতের ক্ষীণ স্রোত বইতে আরম্ভ করে।

আলোক-বিন্দুর প্রতিফলনের কম বেশীর ওপরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টির এবং তার শক্তির কম বা বেশী হওয়া নির্ভর করে। “আকাশ কেন নীল?” গল্পে তোমাদের কাছে আলোকের প্রতিফলন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। কালো চুল অপেক্ষা সাদা দাঁত থেকে বেশী আলোক প্রতিফলিত হয়। কেন এমন হয় সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পার। এই কারণেই ফটো ইলেকট্রিক সেলের ভেতর যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় তার প্রবাহও এক এক সময় এক এক রকম শক্তি সম্পন্ন হয়। সুতরাং মানুষ বা দৃশ্যের চিত্র



বর্তমান ডিক্‌শনারি তৈরি করতে

টেলিভিসন

অস্পষ্ট হতে পারে না। যেখানে যেমনটা হওয়া প্রয়োজন তেমনই হয়। এই জন্ম বেতারে পাঠানো ছবি স্পষ্ট বোঝাও যায়, নইলে সমস্তটা দৃশ্য বা চেহারা একই রকম হয়ে আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়তো। তারপর এই ক্ষীণ বিদ্যুতের স্রোতে পরিবর্তিত বিন্দু বিন্দু আলোক-রেখাকে আর একরকম যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ শক্তিশালী করে, ইথার সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই ঢেউ ভাসতে ভাসতে ঐ বিদ্যুতবিন্দুগুলোকে নিয়ে চলতে থাকে। যেখানে এই ফটো গ্রহণ করা হবে, সেখানেও অনুরূপ গ্রাহক-যন্ত্র আছে। এবং চিত্র প্রতিফলিত হওয়ার জন্ম সেখানে এই যন্ত্রের সঙ্গে একটা পর্দাও থাকে।

সেখানেও ঐ রকম ফুটো-বিশিষ্ট একটা চাকা আছে। ঐ চাকাটিকে প্রেরক-যন্ত্রের চাকার সঙ্গে সংগতি রেখে একই গতিতে চালানো হয়। এই যন্ত্রের চাকাও প্রেরক যন্ত্রের চাকার মতই ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে চালানো হয়। বায়োস্কোপের ছবির মত এই যন্ত্রের সঙ্গে যে পর্দা থাকে তার ওপরে এসে সমস্ত চিত্রটি প্রতিফলিত হতে থাকে।

একটা চাকার সাহায্যে ভাগে ভাগে কোন একটা বড় দৃশ্যের ছবি পাঠাতে হলে, এই চাকার মধ্যে যত বেশি ফুটো থাকবে ছবিটিও মূল দৃশ্যের ততই অবিকল প্রতিলিপি

টেলিভিসন

হবে। কিন্তু চাকার মধ্যে বেশি ফুটো করতে হলে চাকাটি আবার বড় করে তৈরী করতে হয়। বড় চাকা সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করার অনেক অসুবিধা আছে। এই কারণে কোন বড় দৃশ্যের ছবি তুলতে হ'লে, কয়েকটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এবং সম্পূর্ণ দৃশ্যটি পৃথক পৃথক অংশে পাঠানো ও গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি উপায়েও ছবি পাঠাবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখনও ছবি পাঠাবার কৌশলটি খুব নিখুঁত অবস্থায় এসে পৌঁছয় নি। তবে এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যে ভাবে গবেষণা আরম্ভ করেছেন—তাতে মনে হয় কালে এর খুবই উন্নতি হবে।

বেতারে সবাক্ এবং নির্বাক্ উভয় রকম চলচ্চিত্রই পাঠানো যেতে পারে। ইউরোপ ও এমেরিকায় এ শ্রেণীর সবাক্ ও নির্বাক্ চিত্রের খুব প্রচলন আরম্ভ হয়েছে।

ভারতবর্ষেও এইরূপে ছবি দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে। শীগ্গীরই হয়ত কলিকাতায় বা দিল্লীতে এর একটা ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়।

আইনষ্টাইন

(আবেক্ষিক তত্ত্ব)

প্যারিসের একটা রেস্তোঁরায় বসে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক অতি বিষন্নভাবে আকুল নয়নে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছেন। তাঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে একটা ব্যাকুলতার ভাব। ঐ রকম ভাবে রেস্তোঁরার মধ্যে বসে চারদিকে আকুল নয়নে তাঁকে দৃষ্টিপাত করতে দেখে, বাইরে থেকে তাঁরই পরিচিত একজন ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে, রেস্তোঁরার মধ্যে প্রবেশ করে, তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং অতি সম্মানের সঙ্গে তাঁকে অভিবাদন করলেন। ভদ্রলোক আগন্তুককে পেয়ে যেন একেবারে অকুল সাগরে কুল পেলেন। তিনি তাঁকে বললেন—“বন্ধু।” আগন্তুক পাশেরই একটা চেয়ারে উপবেশন করে, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—“কবে এলেন প্যারিসে। তারপর এখানেই বা বসে রয়েছেন কেন? কারও জন্তু অপেক্ষা করছেন কি? ভদ্রলোক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উত্তর করলেন, “আজই আমি এসেছি। কারও জন্তু এখানে অপেক্ষা করছি না। আমি একটু বিপদে পড়ে গেছি। আপনি অনুগ্রহ করে আমায় যদি সাহায্য না করেন—তা হলে আমি ভারী মুশ্বিলেই পড়বো।” মুখে-চোখে

আইনষ্টাইন

আবার তাঁর ফুটে উঠলো একটা দারুণ অসহায়ের ভাব।

উত্তরে আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন—“মুশ্বিল ! আপনার মত লোক—পৃথিবী জোড়া যঁাৰ খ্যাতি—তাঁর আবার কি মুশ্বিল হতে পারে। বলুন—কী সে ব্যাপার। আমি প্রাণপণ করে আপনাকে সাহায্য করবো। আপনার মত লোককে সাহায্য করতে পারলে—পৃথিবীর যে কোন লোক নিজকে ধন্য মনে করবে।” ভদ্রলোক বললেন—“আমি যে হোটেলে এসে উঠছি—সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।”

আগন্তুক ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—“এই মুশ্বিল ! সে হোটেলটির কি নাম বলুন ত। আমি এখনই পথ দেখিয়ে আপনাকে সেখানে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি।”

ভদ্রলোক বললেন—“হোটেলের নাম ত জানি না। সেখানটয়াই ত বিপদ। সে জানেন আমার স্ত্রী। তিনিও সেই হোটেলেই আছেন।”

এই আপনভোলা লোকটির কথা শুনে আগন্তুক ভদ্রলোক বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এমন লোকও এ যুগে ছনিয়ায় আছে যিনি এই বিদেশ-বিঁড়য়ে কোথায় এসে উঠলেন, তার নামটা জানবার পর্য্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করেন না।



আইনষ্টাইন

আইনষ্টাইন

যাক্ তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন,—“আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনি এখানে বসুন। আমি এক্ষুণি আপনার হোটেল খুঁজে বার করছি।”

এই কথা বলেই ভদ্রলোক রেস্টোঁরা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ান একজন পুলিশ কর্মচারীকে বললেন—, “আপনি এখনই একটু টেলিফোন করে, পুলিশ আফিস থেকে জানুন ত মিষ্টার আইনষ্টাইন কোন্ হোটেলে এসে উঠেছেন।” বিদেশ থেকে যারা আসে, পুলিশ আফিসে তাদের প্রত্যেকের নাম, কোথায় তারা থাকবে সব লেখা থাকে।

পুলিশ কর্মচারিটি ঐ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন—“কেন আপনি তাঁর ঠিকানা জানতে চান, বলবেন কি ?”

তিনি বললেন—“আরে সে এক মজার ব্যাপার! ঐ যে দেখুন, মিষ্টার আইনষ্টাইন ঐ রেস্টোঁরায় বসে রয়েছেন। ‘তিনি বললেন—তিনি কোথায় এসে উঠেছেন তা বলতে পারেন না’।”

পুলিশ কর্মচারিটি—এ ব্যাপারটা শুনে অবাক হয়ে মনে মনে ভাবলে—লোকটা কি পাগল না কি? কোথায় এসে উঠেছে তা-ই বলতে পারে না!

যাক্ সে টেলিফোন করলে পুলিশ আফিসে। সেখান থেকে খবর এলো—“মিষ্টার আইনষ্টাইন উঠেছেন ‘হোটেল

বিজ্ঞানের গল্প

১৪৫

আইনষ্টাইন

ডি লুভারে'।" টেলিফোনের উত্তর পেয়ে, পুলিশ কর্মচারিণী 'ঐ ভদ্রলোককে বললেন—“মিষ্টার আইনষ্টাইন যেখানে উঠেছেন—ঐ ত সেই 'হোটেল ডি লুভার'।" এই বলেই বিপরীত দিকের একটা বড় বাড়ী দেখিয়ে দিলে। অবাক্ কাণ্ড! আইনষ্টাইন রেস্তোঁরায় বসে সেই বাড়ীটার দিকেই তাকিয়ে আছেন প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত! অথচ ঐখানেই যে তিনি এসে উঠেছেন তা-ই তাঁর খেয়াল নেই।

যাক্ রাস্তা অতিক্রম করে ত তাঁকে হোটেল পৌঁছে দেওয়া হলো। পথ চলতে চলতে তিনি বলতে লাগলেন—“কী ব্যাপার—কথা বলতে বলতে যে রাস্তা পেরিয়ে এপারে এসে পড়েছিলাম তা-ই মনে নেই।

এদিকে হোটেল আর এক কাণ্ড। আইনষ্টাইনের স্ত্রী—শিশুর মত সরল আর দার্শনিকেরই মত খেয়াল-ভোলা তাঁর স্বামীটাকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরতে না দেখে, ভারী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি নানা রকম আশঙ্কাই করতে লাগলেন। এদিকে তাদের আর এক জায়গায় নিমন্ত্রণে যাবারও সময় হয়ে এলো। সুতরাং তিনি বিলম্ব করা উচিত নয় ভেবে স্বামীকে খুঁজতে লোকজন নিয়ে পথে বেরুবেন বলে স্থির করলেন। তিনি বেরুতে যাবেন ঠিক এমনি সময় তাঁর স্বামী এসে উপস্থিত! তাঁকে নিরাপদে

আইনষ্টাইন

ফিরতে দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং বিলম্বের কারণ শুনে যে ভদ্রলোকটি তাঁর স্বামীকে এনে পৌঁছে দিয়েছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন।*

এই যে শিশুর মত সরল আর দার্শনিকের মত খেয়াল-ভোলা মিষ্টার আইনষ্টাইন এঁর নাম তোমরা শুনেছ কি? এঁর সম্পূর্ণ নাম আলবার্ট আইনষ্টাইন। “ইনিই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক”—অনেক খ্যাতনামা মনীষী এই মত প্রকাশ করেছেন।

ইনি পদার্থ-বিজ্ঞানের যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন—সে তত্ত্ব অতি অভিনব। তাঁর এই আবিষ্কার ফলে, বিজ্ঞান-জগতে এক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। এবং বৈজ্ঞানিকদের গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলো পুরোণো বিশ্বাসের পর্য্যন্ত পরিবর্তন করতে হয়েছে। এঁর আবিষ্কৃত এই তত্ত্বের নাম আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity)। তাঁর আবিষ্কৃত এই আপেক্ষিক-তত্ত্বকে ভিত্তি করে আজ নূতন গতি-বিজ্ঞানের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে।

গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথা বলতে হলে প্রথমেই আমাদের বলতে হয়—গতি ব্যাপারটি হচ্ছে আপেক্ষিক

* পিয়ের ভ্যান্ পাসেন নামে এক ভদ্রলোক, আমেরিকার কোন পত্রিকায় এই গল্পটি লিখেছিলেন। তিনিই আইনষ্টাইনকে পৌঁছে দেন।

আইনষ্টাইন

(Relative)। আপেক্ষিক কথাটা তোমরা হয়ত বুঝতে পারলে না। এই কথাটাই বুঝিয়ে বলছি।

প্রতি নিয়তই যে আমরা একটা গতির ভেতর দিয়ে চলেছি সে কথা কিন্তু আমরা একেবারেই টের পাই না। 'আমরা যে গতির ভেতর দিয়ে কেমন ভাবে চলেছি— তা হয়ত তোমরা বুঝতে পেরেছ। পূর্বে গ্যালিলিওর গল্পেই এ কথাটা তোমরা পড়েছো। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে—পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে প্রতি নিয়তই ঘুরছে এবং তারই ফলে দিন ও রাত্রি হচ্ছে। গোটা পৃথিবীটাই যখন ঘুরছে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নিশ্চয়ই ঘুরছি। কেমন তাই নয় কি। আচ্ছা তা-ই যদি হয়, তাহলে আমরা সে ব্যাপারটা মাত্রই টের পাই না কেন—অথচ পৃথিবী যে ঘুরছে একথা সত্যি। কেন আমরা এ ব্যাপারটা টের পাই না—তা হয়ত তোমরা নিশ্চয়ই জানো না। সে কথাটাই তোমাদের বলছি। কারণ পৃথিবীর এই ঘুরবার ব্যাপারটা তুলনা করবার মত কোন কিছুই আমরা আমাদের চতুর্দিকে দেখতে পাই না। পৃথিবী যেমন ঘোরে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে একই গতিতে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ঘোরে সুতরাং কারোই বোঝবার উপায় থাকে না—কে ঘুরছে আর কে ঘুরছে না।

আইনষ্টাইন

একেই বলে আপেক্ষিক অর্থাৎ একের সঙ্গে অপর সম্পর্ক বিশিষ্ট।

গতি বিজ্ঞান নিয়ে পণ্ডিতেরা বহুকাল থেকেই নানা রকম গবেষণা করে আসছেন এবং এ সম্বন্ধে বহু নূতন তত্ত্ব তাঁরা আবিষ্কারও করেছেন। পূর্বে তোমাদের গ্যালিলিওর গল্পে বলেছি যে, এরিষ্টটল নামে একজন পণ্ডিত মত প্রকাশ করেন যে, কোন উঁচু জায়গা থেকে যদি ভারী ও পাতলা দু'টো জিনিষ একসঙ্গে ফেলে দেওয়া যায়, তা হলে ভারী জিনিষটাই প্রথম মাটি স্পর্শ করে। কিন্তু গ্যালিলিও প্রমাণ করলেন যে, এ সিদ্ধান্ত ভুল। কোন উঁচু জায়গা থেকে ভারী ও পাতলা দু'টো জিনিষ ফেলে দিলে, তা একই সময় মাটি স্পর্শ করবে, যদি যে জায়গা দিয়ে ঐ জিনিষ দু'টো এসে পড়বে, সেই পথের বায়ুর চাপ সর্বত্রই সমান থাকে। এরপর নিউটন বায়ুর গতি সম্বন্ধে কতকগুলো নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ এবং মহাকর্ষণের কথাও আবিষ্কার করেন। তিনি বলেছিলেন যে, প্রত্যেক জিনিষের গতি-বেগ প্রত্যেক জিনিষ দ্বারা সকল সময়ই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ সব কথাই পূর্বে তোমাদের বলেছি। কিন্তু এই গতি-বিজ্ঞান বিষয়েই আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত “আপেক্ষিক তত্ত্ব” অতি অভিনব। এই আপেক্ষিক তত্ত্বের কথাই এখন তোমাদের বলবো।

আইনষ্টাইন

চিরকালই মানুষের বিশ্বাস দূরত্ব বা পার্থক্য, পদার্থের মাত্রা বা জড়মান এবং সময়ের মূল্য বা পরিমাণের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আইনষ্টাইন পরীক্ষাদ্বারা নিভুল ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এ ধারণা একেবারেই ভুল। কোন দূরত্ব বা পার্থক্য, পদার্থের মাত্রা বা জড়মান এবং সময়ের মূল্য বা পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এবং গতির সঙ্গে এর একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। দুইটা গাছের মধ্যে যদি পনের হাত দূরত্ব বা পার্থক্য থাকে—তবে প্রত্যেক লোকই সকল সময় ঐ দুটো গাছের মধ্যে ঐ একই পার্থক্য দেখতে পাবে—এটাই সর্বসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু আইনষ্টাইন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, একজন চলমান মানুষের কাছে ঐ পার্থক্য কম বলে মনে হয়। সেই চলমান লোকের চলবার গতি যতই বৃদ্ধি পাবে পার্থক্যও ততই তার কাছে কম বলে মনে হবে। আলোকের গতি প্রতি সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। যদি একজন মানুষের পক্ষে আলোকের মত অতি দ্রুতবেগে ছুটে চলা সম্ভব হতো—তা' হলে তার কাছে মনে হতো যেন দু'টো গাছ একেবারে গায় গায় লেগে আছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, দূরত্ব বা পার্থক্যের মূল্য সকল অবস্থায়ই এক থাকে না। সুতরাং দশ হাত, পনের হাত

আইনষ্টাইন

পার্থক্য বা দূরত্ব এ কিছু নয়। গতির সঙ্গে এর মূল্যের একটা সম্পর্ক আছে। গতির সঙ্গে সঙ্গেই এর মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়ে থাকে। একে অপরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-বিশিষ্ট। এই কারণেই একে বলা হয় আপেক্ষিক (Relative)। তেমনি কোন একটা জিনিষ যদি পাঁচসের ওজন বিশিষ্ট হয়, তবে সকল সময়ই সেই জিনিষটির ওজন পাঁচ সেরই থাকবে না। যদি একে খুব দ্রুত গতিতে চালানো যায় তবে এর মাত্রা বা জড়মান বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। আলোকের মত গতিতে ঐ জিনিষটি চালালে ওর মাত্রা বা জড়মান এত বেশি হবে যে, তা আমরা কল্পনায়ও আন্তে পারি না। একজন মানুষ যদি উড়োজাহাজে চড়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকে, তখন যদি সেখান থেকে তার চোখ পড়ে পৃথিবীর কোন ঘড়ীর ওপরে—তাহলে সে দেখবে যে পৃথিবীর ঘড়ীটা সোঁ চলছে। যদি তখন তার হাতের ঘড়ীতে বেজে থাকে দশটা তা হ'লে পৃথিবীর ঘড়ীতে সময় তার চেয়ে কম হবে। আলোকের মত দ্রুতগতিতে উড়োজাহাজটা যদি ছুটতে পারে তবে সময় খুবই কম মনে হবে। তোমরা হয়ত কথাগুলো শুনে মনে মনে ভাবছো এগুলো সব ফাঁকী—চোখের ধাঁধা মাত্র। কিন্তু সত্যি সত্যি তা নয় আইনষ্টাইন রীতিমত পরীক্ষা দ্বারা এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আইনষ্টাইন

কতটুকু গতির সঙ্গে কতটুকু মাত্রা বা জড়মানের, পার্থক্য না দূরত্বের এবং সময়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় তা-ও তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়েছেন। আইনষ্টাইনের মোট কথা হলো এই যে, মাত্রা বা জড়মান দূরত্ব বা পার্থক্য এবং সময় সকল অবস্থায়ই একরকম থাকতে পারে না—এর সম্পর্ক গতির সঙ্গে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা আবিষ্কারের পর থেকে আইনষ্টাইনের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও বিজ্ঞানের আরও বহু নূতন তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন।

আলবার্ট আইনষ্টাইন সুইজারল্যান্ডের জুরিচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষা শেষ করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করেন। পরে সেখান থেকে প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে আসেন। প্রেগ থেকে তিনি প্রাশিয়ার বিজ্ঞান পরিষদে যোগদান করেন। সেখানেও তিনি গবেষণা করতেন। বর্তমানে কোন বিশেষ কারণে সে পদও তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

